সমন্বিতা

২০২১

শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

স ম ন্বি তা
২ ০ ২ ১

শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ
কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

PROFESSOR (DR.) MITA BANERJEE
Vice Chancellor, Kanyashree University

Former Vice Chancellor, The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration.

Former Professor Emeritus, Former Pro Vice Chancellor & Former Dean, Adamas University.

Former Chief Advisor, Center for Advanced Studies and Research in Education.

Former member of a High powered Committee of NCTE, New Delhi.

Former Chairperson of Two Curriculum Committees, Higher Education Department, Government of West Bengal.

Former Professor, Department of Education, University of Calcutta.

Official Address: Krishnagar Government College Campus, Krishnagar, Dist.-Nadia, Pin-741101, West Bengal, India

Residential Address: 154, Bakul Bagan Road, Bhowanipore, Kolkata- 700025

Message from Vice Chancellor

Kanyashree University started its journey on and from September, 2020. Since it's inception, Kanyashree University introduced four subjects for Post Graduate course of study and Education is one such course. The journey since then has been very smooth, inspiring and encouraging with a host of renowned and resourceful Guest teachers and enthusiastic female students. The subject Education has its own glory for years and Kanyashree University will hold the flag high to keep up the reputation and importance of the subject Education.

The recent publication of its bi-lingual magazine 'Samanwita' is undoubtedly an outcome of its continuous as well as strenuous efforts to inspire learners for creative writing. It is expected that this magazine will gradually travel its path of glory and sunshine with a ray of hope to manifest the promising talents among our educands with their innovative thoughts.

Mita Banerjee

Prof.Mita Banerjee
Vice Chancellor
Kanyashree University

Official E-mail: kanyashreeuniversity@rediffmail.com, kanyashreeuniversity@gmail.com

আ হ্বা য় কী য়

সৃষ্টিতেই আনন্দ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই আনন্দ সঞ্চারই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। পাঠককুল হয়তো সাহিত্য রসদ সেভাবে এখানে নাও পেতে পারেন, কিংবা পেতে পারেন – পাওয়া বা না পাওয়ার আরো ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আমরা কন্যাকুলের সৃষ্টির নেশায় মেতে ওঠার একটি 'প্লাটফর্ম' তৈরি করে দিতে চেয়েছি। 'সৃষ্টি-নেশা'য় মেতে উঠেই হয়তো এদের মধ্যে থেকে কাউকে আমরা পূর্ণাঙ্গ লেখক হিসেবে ভবিষ্যতে পেতে পারি। আবার কারও হয়তো এই লেখাই জীবনের প্রথম লেখা, যা তাঁর সহপাঠিনীদের কাছে এবং বৃহত্তর পাঠকদের কাছেও তাঁদের লেখিকা-সত্তার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হ'তে পারছে। যাই হোক, কন্যাকুলের প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে তাঁদের লেখিকা-পরিচয় স্বীকৃতি পাবে এই উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ - প্রকাশিত এই পত্রিকা । আরো একটি দিক থেকে বিশেষত্বের দাবি রাখে, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা এটি। কন্যাকুলের লেখা পাঠক মননে সমাদর পাবে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আশা করছি 'সমন্বিতা'র ধারাবাহিকতা।

ড. অনিরুদ্ধ সাহা
সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ
আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজ, আসাননগর, নদীয়া

অতিথি অধ্যাপক ও কোর্স কো-অর্ডিনেটর
শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সূচিপত্র

কবিতা		পৃষ্ঠা
সর্বজয়ী কন্যাশ্রী	সুস্মিতা পাল	০১
শিক্ষা	লিসা কার্ফা	০২
আহা কি আনন্দ	মারিয়াম খাতুন	০২
সূর্যোদয়	নিকিতা প্রামাণিক	০৩
অধিকার	নিকিতা প্রামাণিক	০৪
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়	মিঠু মণ্ডল	০৫
নারী	পূর্ণিমা হালদার	০৫
সময়	রিম্পা দে	০৬
বর্ষা	সান্তনা ফরিদা	০৭
জল জীবনের চাবিকাঠি	সান্তনা ফরিদা	০৮
অবহেলিত নারী	সাথী বাড়ে	০৮
প্রতিবাদী নারী	পূজা হাজরা	০৯
অভীঃ	সুতৃষ্ণা রায়	১০
সুপ্ত ইচ্ছা	সালমা জাহান খাতুন	১১
সবুজ খেতে	এসমিনা খাতুন	১২
চিনতে হবে এই সমাজ	কুরসিয়া খাতুন	১২
তরুণী	মৃন্ময়ী সরেন	১৩
পেন বিক্রি	রিনা খাতুন	১৪
পুনরাবৃত্তি.....অশান্ত....	মাম্পি দাস	১৪
লকডাউন	রিক্তা ঘোষ	১৬
করোনা ভাইরাস	সুস্মিতা রায়	১৮
হারানো স্মৃতি	রিমা কর্মকার	১৯
নারী ও সমাজ	তনুশ্রী মণ্ডল	১৯
নারী	রাজিয়া সুলতানা	২০
স্মৃতি	কুলসোম খাতুন	২১
A Pledge To Take	Basabdatta Roy	২২
প্রবন্ধ ও গল্প		
পণপ্রথা ও বিপন্ন নারী সমাজ	ফুলেশ্বরী খাতুন	২৩
মাধবী ও তার পাখি	কৃপাময়ী দে	২৫
Science Behind Holding A Pen or Pencil Properly	Shreya Bhattacherjee	২৭
সাহসী কাঠবেড়ালি	তৃষা বিশ্বাস	২৮
বন্ধু	সুদীপ্তা সাহা	২৯
ভোলু	মারিয়াম খাতুন	৩১
স্বপ্ন-শব	মুক্তি খাতুন	৩৩
আমি ধর্ষিতা	গৌরী বিশ্বাস	৩৫
এক রাতের অভিজ্ঞতা	মুক্তি খাতুন	৩৮
হুল বিদ্রোহ	মৃন্ময়ী সরেন	৪১
স্বপ্নপূরণ	মেহেনাজ পারভীন	৪২
শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ	প্রিয়া সালুই	৪৪
প্রথম দেখা	রুমা ঘোষ	৪৫
নারীদের কথা	সুমনা নাথ	৪৬
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়	অনুপমা ঘোষ	৪৭
অঙ্কন		
চিত্র ১-৪	সুদীপ্তা সাহা	৪৯-৫৩
চিত্র ৫	বাসবদত্তা রায়	৫৪
অন্যান্য		
ভেজিটেবল মশলা পরটা	মৃন্ময়ী সরেন	৫৫

সর্বজয়ী কন্যাশ্রী

সুস্মিতা পাল
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

কন্যা মোরা গর্ব সবার,
কন্যা মোরা রত্ন,
কন্যা মোরা মাতৃময়ী, একটু নিয়ো যত্ন।।
এক রূপেতে দশভুজা, অন্য রূপে স্ত্রী,
পরিচয় শুধু একটাই মোরা কন্যাশ্রী।।
কন্যা মোরা লাঙ্গল হাতে গড়ি সবুজ মাঠ,
কন্যা মোরা কলম হাতে চালাই রাজ্যপাট ।।
কেউ বা ডাকে মা, আম্মি
কেউ বা ডাকে মাদার,
কখনো বা রোগীর সেবায় মোরা হই সিস্টার ।।
আমাদের এই শিক্ষালয়ের আজ প্রস্তর ভিত্তি,
কন্যাশ্রীর হবে নাম থাকবে না একরত্তি ।।
কন্যা মোরা স্বপ্ন দেখি কন্যাশ্রী র সাথে,
নতুন সমাজ গড়ে তুলবো একসাথে হাতে হাতে ।।
বাহির হতে আজ দেখিনু পৃথিবীর কঠিন সমাজ খানি,
লড়তে হবে জীবন যুদ্ধ,
লিখবো জীবন কাহিনী ।।
কন্যাশ্রী প্রকল্প আজ প্রতি ঘরে ঘরে,
তাই তো মোরা স্বপ্ন দেখি আজকে দু চোখ ভ'রে ।।
কন্যা মানে লক্ষ্মী রূপী, কখনো সরস্বতী।
কখনো মোরা ভীষণ যুদ্ধে হই যে মহারথী ।।
আজকে মোদের শিক্ষালয় পেলো কন্যাশ্রী নাম ।
মুখ্যমন্ত্রীকে মোরা জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম ।।

শিক্ষা

লিসা কার্ফা
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

শিক্ষা মানুষকে গ'ড়ে তোলে
শিক্ষাই আনে জগৎ-এর আলো
শিক্ষাতেই আসে মানবিকতা বোধ।
শিক্ষাই বাড়ায় মানুষের অভিজ্ঞতা
শিক্ষাতেই হয় মানুষের কল্যাণ
শিক্ষা মানুষ এর কাছে বহু মূল্যবান।
শিক্ষা মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয় চেতনা
শিক্ষাই পারে ভোলাতে কষ্ট যন্ত্রণা।
শিক্ষা পারে মোছাতে কুসংস্কার
শিক্ষাই আনতে পারে সমাজ এ নতুন সংস্কার।
শিক্ষা একমাত্র পারে সমাজ কে সজাগ করতে
শিক্ষা জন্ম দেয় মনের মধ্যে নতুন আবেগ।
শিক্ষা পাবার জন্য থাকে ক্ষুধা
শিক্ষা ছাড়া জীবন হয় বৃথা।

আহা কি আনন্দ

মারিয়াম খাতুন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

আহা কি আনন্দ
লকডাউন উঠবে,
আহা কি আনন্দ
ট্রেন খানা ছুটবে।
আহা কি আনন্দ
ইউনিভার্সিটি যাবো,
আহা কি আনন্দ
বন্ধুদের দেখা পাবো।
আহা কি আনন্দ
হোস্টেলে থাকবো,
আহা কি আনন্দ
সারারাত জাগবো।

আহা কি আনন্দ
যাবো আমি ঘুরতে,
আহা কি আনন্দ
বসবো না আমি পড়তে।

সূর্যোদয়

নিকিতা প্রামাণিক
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

আজ সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়াবার ..
শত উপহাস ও উপেক্ষার জবাব দেবার.!
দিনের শেষে সূর্য ডোবায় হয়ো না হতাশ..
রাতের শেষেই সূর্যোদয়–রেখো এ বিশ্বাস ।

সভ্যতার সূর্যোদয় হয়েছে এটা ঠিকই.
তবুও সমাজের সূর্যোদয় হয়নি তো আজও..
আদি থেকে অন্ত এই সৃষ্টি, সব নারীরই স্বরূপ .
তবে এই নারীকেই কেন হতে হয় বঞ্চিত?

তুমি নিজেই জানো না হে নারী .
তোমাতে বিরাজমান অসীম শক্তি..
কলঙ্ক নিয়ে চাঁদ যদি হতে পারে অভিহিত.
তবে তুমি কেনও পারবেনা হতে শৃঙ্খল মুক্ত..?

নারী!, তোমায় যদি একটা ছোটো ঘর দেওয়া হয়,
তবে , তুমি যে দাও উপহারে একটা সংসার.....
তোমায় যদি একটা শুক্রাণু দেওয়া হয়,
প্রতিদানে ,তুমি করো নিষ্পাপ মানব শিশু দান.।

নারী!, তোমার উপেক্ষা করে যে জন ..
সে , হতে পারে না এই সমাজের সূর্যোদয়..
নারী!, তোমার উন্নতি ও শিক্ষার আলোয়..
ক্রমশ হবে এই মানব জাতির সূর্যোদয়।

অধিকার

নিকিতা প্রামাণিক
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

'অধিকার', 'অধিকার' - এই শব্দটা কি শুধু পুরুষদের জন্য,
কেন এটি নারীর জন্য নয়??
এই নারী জন্ম যে নেয় বাবার ঘরে লক্ষ্মী হয়ে,
পরে সে যায় স্বামীর ঘরে ..
আচ্ছা, তবে কি নারীর কি কোনো ঘর নেই,
নেই তাদের কোনো ' অধিকার' ?

একজন পুরুষ যদি হয় সিংহের মতো
তবে, নারী হয় সকল আশ্রয়কারী, স্নেহময়ী।।
একজন নারী যে হয় মা, আবার মেয়ে ,আবার বউ,
তবে সকল কাছে সব কিছুর শ্রেষ্ঠ নয় কে?

নির্যাতিত, নিপীড়িত তকমা শুধু নারীর কেন,
পুরুষ এর নির্যাতক কেন নয়?
একজন নির্যাতক পুরুষ যদি ,
সমাজ এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, চাকুরীজীবী হয়
তবে, নির্যাতিত নারী কেন হয় এমন টা,
কেন, নেই তাদের অধিকার?

আচ্ছা সমাজের খারাপ ও নীচু কাজে শুধু নারীর অধিকার,
ভালো কাজে নেই কেন?
বলা হয় নারী নাকি পুরুষ-এর সমান,
তবে কেনো, নারীর নেই কোনো স্বাধীনতা?
আচ্ছা নারী কি শুধুই গৌণ কাজে কোনো,
প্রধান কাজে নেই কেন?

জাগো সমাজ-এর নারী,
আদায় কোরে নাও আধিকার,
দেখিয়ে দাও নারী ও পারে,
সুন্দর গোলাপ-এর মতো ফুটতে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়

মিঠু মণ্ডল
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় "কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়",
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই কোনো জাতিভেদ।
জাতিবর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে,
সকলে মিলে মিশে আসে এই প্রতিষ্ঠানে,
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিন শুরু হয় গুগল্ মিট এ,
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাত ধ'রে,
শেষ হয় পড়াশোনা আর
জীবন গড়ার নতুন নতুন স্বপ্ন নিয়ে।
বাংলা- ইংরেজি- ইতিহাস-শিক্ষাবিজ্ঞান নিয়ে চার বিভাগ,
সকলে আমরা সকলের তরে কেউ নয় পৃথক।
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সকলের সেরা,
আমাদের শপথ হল,
নতুন দেশ গড়া।।

নারী

পূর্ণিমা হালদার
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

নারী বলেই,
বাবা যখন জানলো মায়ের গর্ভের ভ্রূণ কন্যা—
শুরু হয়ে গেলো সোনিওগ্রফির অফিস খোঁজা,
কারণ কি? কারণ হ'ল কন্যা নাকি বোঝা।

নারী বলেই,
হাজারো বাধা সত্ত্বেও যখন জন্ম দিল মা,
তখন বুঝলাম এরা মানুষ করলেও মানুষ হয়ে উঠতে দেবে না।

নারী বলেই,
সমস্ত শৃঙ্খলার বেরি আমার পায়েই বাঁধা,
কথা কম বললে অহংকারী বেশি বললে বোকা ।

নারী বলেই,
ঘরে থাকলে কুনোর ব্যাঙ,বাইরে বেরোলে ধর্ষিতা,
আর প্রতিবাদ করতে গেলেই হ'তে হবে নষ্টা!

এই যদি হয় তোমাদের ভাবনা,
তবে শোনো....

আমি নারী আমি একাই সব পারি ।
আমি সীতা আমি সাবিত্রী আমি কল্পনা চাওলা।
আমি জননী আমি ভগিনী আমি জায়া।
আমি শীতল জল আবার উত্তপ্ত লাভা,
আমি নইলে মিথ্যা হতো সূর্যোদয় মিথ্যা হতো সূর্যাস্ত,
আমি মহীয়সী। আমি বিদ্রোহিনী,
আমি নারী আমি একাই সব পারি...!!!

সময়

রিম্পা দে
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

কখনও কি ভেবেছে কেউ!
সময়ের কত প্রজাতি?
কখনো দিন, কখনো রাত, কখনো কান্না, কখনও হাসি।
হঠাৎ দেখি সেই সময়ে খবর পেলাম হোয়াটসঅ্যাপে......
চলে গেলো দূর সুদূরে নাম জানা সেই অমূল্য হাসি।
মানুষ নাকি মানুষের তরে
আজ সে মানবিকতাও প্রকাশ পায় সোস্যাল সাইটে।
এই ভুবনে কত নেতা, কত মন্ত্রী ।
কত দাতা, কত ক্লান্তি।
আর কত পোস্ট শেয়ার কত পোস্টকে ঘিরে
প্রচুর লাইক আর কমেন্টের ভীড়ে
মনে পড়ে মান্না দের সেই গান 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই'
মনে পড়ে স্কুলের সাদাকালো সিলেবাস।
জানি সব বাসনা থেকে যাবে এই কবিতায়,
তবে আবারও ফিরে পেতে চায় পুরনো সে সময়।

বর্ষা

সান্তনা ফরিদা
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

রিমঝিম বৃষ্টি নিয়ে
এল মেঘের দল,
তাই দেখে প্রকৃতির সব
আনন্দে উচ্ছল।

শুকনো গাছে শুকনো পাতা
হেসে হেসে বলে,
আজকে আমি সবুজ হলাম
বর্ষা তোমায় পেয়ে।

ছোটো ছোটো গাছে অনেক
ছোটো ছোটো ফুল ফোটে,
মেঘের গর্জন শুনে
পশুরা সব কাঁপে।

সাদা শাড়ির বেশে
বৃদ্ধা এসে হাসে,
বৃষ্টি মাথায় নিয়ে
আনন্দে সে নাচে।

চারিদিকে কতো আনন্দ
কতো ভালোবাসা,
বর্ষা তুমি বন্ধু হয়ে
দিলে আমাদের দেখা,
তোমায় পেয়ে গর্বিত
আজকের প্রকৃতি মাতা।

জল জীবনের চাবিকাঠি

সান্তনা ফরিদা
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

জল আমাদের সৃষ্টিকর্তা
জলেই আছে প্রাণ,
তৃষ্ণা পেলেই বোঝা যায় ভাই
জলের কতো দাম।

জল আমাদের জীবনদাতা
জল আমরা খায়,
জলের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে
বেঁচে থাকার উপায়;
তবুও আমরা সেই জলেরই
করি অপচয়।

জল আমাদের জীবন তাই
জল আমরা চাই,
পৃথিবীতে কিছু কি আছে?
যা জলের মতো হয় !

জলে আছে রোগজীবাণু
জলেই আছে প্রাণ,
সবাই জলকে তাই
জানাই সম্মান।

অবহেলিত নারী

সাথী বাড়ৈ
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

কন্যা জন্ম হলেই তুমি
তেলে বেগুনে জ্বলো,
কোন পুরুষের গর্ভে তুমি

জন্ম নিয়েছো বলো?

আজ তুমি নিজে পুরুষ
সেই অবদান কার?
নারী গর্ভে জন্ম নিয়ে
সেই ধরছো নারীর ঘাড়?

কোন শিশুটি পুরুষ হবে
কোনটা হবে নারী,
ঈশ্বরের ইচ্ছা সেটা
ইচ্ছা নয় নারীর।

কন্যা শিশুর দায়টা কেন
নারীর ঘাড়েই চাপে,
আদৌ কি তাতে
নারীর “দোষ” আছে?

পুরুষ পুরুষ বলে
এত যে তুমি হাঁকো,
সত্যি যদি পুরুষ হও
তাহলে অবহেলিত নারীর
পাশে থেকো।।

প্রতিবাদী নারী

পূজা হাজরা
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

আজ নারী দাসত্বের শিকল ভেঙে,
বাইরের প্রকৃতির দিকে বাড়িয়েছে পা।

আজ তাদের মনে-
নেই কোনো ভয়,
নেই কোনো লোকলজ্জা।

আজ নারী দেখিয়ে দিয়েছে তাদের ক্ষমতা, তাদের অধিকার,
তারাও সমাজে সমান ভাবে বাঁচবে।

আজ নারী দেখিয়েছে– তারাও পারে,
তারাও–পুরুষের থেকে কোনো অংশে কম নয়।

আজ নারী অন্যায় কে করে না প্রশ্রয়,
করছে শত প্রতিবাদ,
অন্যায়ের দিন হচ্ছে এবার শেষ।

আজ নারী তোমার ক্ষমতা অতুলনীয়,
শত অসম্ভবকে করছো জয়,
তাই আজ নারী হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী।

অভীঃ

সুতৃষ্ণা রায়
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

"অভীঃ" ভয়শূন্য হও, কিসের এতো ভয়-
এ সমূহ জগৎ তাঁরই অনুগত,
যে ভয়কে করে জয়।

আকাশের দিকে কানপেতে দেখো
তুমিও শুনতে পাবে ঋষি কণ্ঠ নিনাদিত স্বর
জগতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ যাঁর নেই ভয় -ডর |

কি হয়েছে হেরেছি ব'লে? হার জিতেরই জীবন
উচ্চস্বরে ঘোষণা করো, পথ যতই হোক কঠিন
এই লড়াই চলবে মরনপণ |

অনেক হ'ল ঘুমিয়ে থাকা,
এবার সময় জেগে ওঠার
এবার সকলেরে হ'তে হবে উদ্যত,
হ'তে হবে তোমায় দুর্নিবার।

এসো সাহস অবলম্বন করি,
সত্যে প্রতিষ্ঠিত হোক প্রাণ

আগামীর বীরত্বের ইতিহাস সাক্ষী থাকুক
রচিত হোক আমাদেরই আত্মবলিদান|

আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হোক,
জাগ্রত হোক প্রাণ
অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা,
করবো জীবনের জয়গান||

একের তরে বাঁচবো না মোরা
সকলের তরে সকলের এ জীবন,
"জীবে প্রেম" এই হোক আদর্শ
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
আমাদের সম্মুখে উত্তরণ।

সুপ্ত ইচ্ছা

সালমা জাহান খাতুন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

কবিতায় যতটুকু
ততটুকুই কি জীবনের প্রকাশিত?
নাকি? আরও আছে
এর থেকে কিছু কম বা একটুখানি বেশি....
ছন্দ মেলাতে মেলাতে কিছু বাদ যায়নি তো
কিছু অযাচিত কথা যোগ হয়নি তো
নাহ, ভাবনা কিসের।
যেটুকুই থাক কম বা বেশি,
সবই তো মনের কথা
প্রকাশ করার ছিল, প্রকাশিত হয়েছে
আর বড় সত্য কি চাই
জীবনের সকল সত্যই যে কবিতাতে
নিহিত আছে।

সবুজ খেতে

এসমিনা খাতুন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

সবুজ খেতে উল্লাসে ভেসে আছে মনে-ই মাঝি ।
সবুজ চারপাশে বসে আছে চাষি।
সবুজ মাঠে যাচ্ছে কৃষক তালে তালে নেচে।
সবুজ শস্যে দিচ্ছে তারা পাড়ি ।

আধারে বিলাসে ছুটে যায় মজুর,
দীর্ঘ দিবসে রৌদ্র নাহি পাকে,
দ্বিপ্রহর গড়ার আগে ফিরবে তারা বাড়ি।
স্নান করে খাওয়া সেরে ছুটবে তারা আড্ডা গলি।

চিনতে হবে এই সমাজ

কুরসিয়া খাতুন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

এসো আজ খোলা আকাশের নীচে,
এসো আজ একে অপরে যায় মিশে।
খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায়,
অবরুদ্ধ ঘর ভেঙে একে অপরকে হাত বাড়াই।

সৃষ্টিকর্তা মানুষের লাগি বুনিয়াছে বিরাট পরিবার।
জানোয়ারেরা মানুষের মুখোশ পরে পৃথক করেছে বারবার।
স্বার্থ নামের খোলশটা দাও ছিঁড়ে।
চলে এসো আজ রূপ সাগরের তীরে।
চেতনার গতি আনো স্থবির পায়ে,
মানুষ নামের পোশাকটা দাও গায়ে।

আজ অবারিত হোক মন্দিরের ওই পূজা,
শুরু কর আজ নিজেকে নিজেই খোঁজা।
মসজিদে গিয়ে সকলে পড় নামাজ,
খোঁজা শুরু করো মানুষ নামের সমাজ।

সবাই যদি মানুষ তবে চিন্তা কেন ভিন্ন,
সবার রক্ত এক ই ভাবে সুরটা কেন ভিন্ন?
কাহার উপর ভিন্ন হাতে কে ঘোরাই কালো ছড়ি?
এসো আজ তাকে চিনে নিতে হবে, হয়েছে অনেক দেরি।

তরুণী

মৃন্ময়ী সরেন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

আমরা হলাম তরুণী
সবাইকে অনেক আপন করি
আমরা সবার ভালো করি
সমাজের মঙ্গল কামনা করি।

আমরা হলাম তরুণী
সবার মনে সাহস আনি
সবাইকে সচেতন করি
নিজে নিজের মূল্যবোধকে জাগ্রত করি।

আমরা হলাম তরুণী
বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি
অন্যের বিপদে সাহায্য করি
সমাজকে সুস্থ রাখি।

আমরা হলাম তরুণী
মাথা নীচু না করে,
সবাই মিলে প্রতিবাদ করি
সবার মধ্যে ঐক্যবোধ বজায় রাখি।

আমরা হলাম তরুণী
এসো সবাই হাতে হাত রিখি
সবাই একসাথে এগিয়ে চলি
অন্যায় অত্যাচারের বিনাশ করি।

পেন বিক্রি

রিনা খাতুন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

ট্রেন থেকে পেন কিনে
মিতালি সেন,
তিনমাস পরে ভাবে
তাহা বেচবেন।

তিনমাস আগে কেনা
দশ টাকা দাম,
পাঁচ টাকা পেলে বেশি
লাভে নাই কম।

জহিরুল মালদার
বলে মৃদু হেসে,
তিনমাস পরে তবে
ফ্রিতে নেব এসে।

পুনরাবৃত্তি.....অশান্ত....

মাম্পি দাস
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

ছোট্ট সন্দীপন শুধায় মাকে-
দাদু-ঠাকুরমা কেন বন্দি ঘরে
ওদের জন্য আয়া-র কেন দরকার পড়ে?
মা বলেন, এসব কথা ছাড়ো
বড়ো হলে বুঝবে সবই
এখন শুধু পড়াশোনা করো।

দু'দিন ফুরায় আবার বলে সে
মাগো–দাদু-ঠাকুমার জন্য
থালা গ্লাস কেন পৃথক করে রাখো?
ওদের কাছে গেলে পরে, আমায় কেন বকো?
মা বলেন,'বেয়াদপ' বড্ড বেশি
বাড়াবাড়ি করছো তুমি চুপটি করে তোমার মতো থাকো।
বাবা বলেন–নীরব থেকে মায়ের কথা শোনো
বয়স হলে এমনই হয়
ভালো করে জানো।
হঠাৎ একদিন দাদু অচিন লোকে পাড়ি দিল
জামা কাপড় বালিশ বিছানা
থালা গ্লাস সবই বাধা হলো।
সন্দীপন কাঁদিতে কাঁদিতে জেদ- ধরিল থালা গ্লাস খানি তার চাই
দাদু স্মৃতি সযত্নে রাখিবে দাদুভাই।
মা-বাবার অনুনয় শুনিল না
অবশেষে রাখিয়া গেল সন্দীপনের আশ্রয়।
সে অতি যত্নে তুলে রাখে ও নিরাপদ জায়গায়।
একদিন ঠাকুমা মরিল– সন্দীপন সেই বায়না ধরিল
থালা গ্লাস খানি তার চাই
তাই হলো।
দিনে দিনে বাড়িল সন্দীপন বড়ো চাকরি লইয়া দেশে বিদেশে ঘোরে
ভোলে না কভু সেই গৃহ,-দাদু ঠাকুমার থালা গ্লাসখানি।
দিনে দিনে বাবা-মা বৃদ্ধ হইল
সেই ঘর-আয়া,সে প্রস্তুত রাখিল।
সন্দীপন গৃহে ফিরিল
তারপরে একদিন অতি যত্নে
সেই ঘরে পিতা-মাতার থাকার বন্দোবস্ত হইলো।
সেই থালা গ্লাস আসিল
যেন পাকাপাকি আয়োজন
বৃদ্ধ বাবা-মা রেগে আগুন- জিজ্ঞাসিল আমরা কেন হেথায়?
সেই থালা গ্লাস-উদ্দেশ্য কি তোমার?
বিনীত কণ্ঠে কহিল সন্দীপন-
এখানেই বৃদ্ধ পিতা-মাতার
শেষ আশ্রয়

আমার থালা-গ্লাসখানি আমার দাদু ঠাকুমার
বৃদ্ধ জনের শেষ সম্বল
অতি আদরে রেখেছি তুলে
তোমাদের দিব বলে।
অবনত মস্তকে বুঝিলো পিতা-মাতা
এসব আমাদেরই আয়োজন
তাহারি পুনরাবৃত্তি।
পিতা-মাতা দুজনার
অতীতের কথা স্মরণে আসে
কাঁদে আর চক্ষু জলে ভাসে
সন্তান মোদের দিয়েছে শিক্ষা
তাইতো মরছি অনুতাপে।
পিতা-মাতা অযত্নে রেখে
যে ভুল করেছি মোরা
আর যেন কেহ না করে।

লকডাউন

রিক্তা ঘোষ
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

শুনছি নাকি দেশ থেকে বিদেশ
লেগেছে লকডাউনের ছোঁয়া।।
গত কয়েকদিন ধরে
করোনা ভাইরাসটা উপদ্রব করছে ।
তার জন্যই তো মাস্ক পরা,
হাত ধোয়া, লকডাউন
কত কী যে হবে কে জানে
চারিদিকে সবাই বলছে বেরিয়োনা,
না বেরোলেই বুঝি হয় লকডাউন?
বাড়ি থেকে বেরোলেই
এদিকে ওদিকে পুলিশের ইস্তাহার।
কে জানে বাবা আর কতদিন...

মুখ বুঁজে বাড়িতে থাকবো।।
আমাদের গ্রামের ছেলেগুলো
বিদেশ থেকে কত কষ্টে ফিরছে।
তাও আবার হাজার কিমি পায়ে হেঁটে!
তার উপর বাড়িতে এসেও
আবার আধ পেটা খাওয়া।
রেশনের যা কিছু পাই
তা দিয়েই দিন চলে যায়।।
তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে
আর কত কী দেখতে হবে
জানিনে বাপু.........
শুনেছি নাকি শহরের
ফুটপাথের মানুষগুলোরও অনাহার।
তাদের অবস্থাও কী আমাদেরই মতো?
ওখানে তো অনেক....
বাবু - সাবু মানুষ থাকে।
লকডাউনে নাকি তাদের
কিছুই.... এসে যায় না।
তারা কী বুঝতে পারবে,
গরীবের লকডাউনের জ্বালা?
সবাই বলছে নাকি.....
লকডাউন ই করবে ভাইরাসকে নষ্ট।
দেখাই যাক....
লকডাউনের পরে গরিবের জীবনে
কবে প্রভাতের সূর্য ওঠে,
কবেই বা অনাহার ঘোচে।
সেই আসাতেই নতুন করে
বুক বাঁধছি আমরা।।

করোনা ভাইরাস

সুস্মিতা রায়
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

করোনা ভাইরাসের নেই কোনো রূপ,
আমাদের সবাইকে করেছে নিশ্চুপ ।।
হাহাকার.... হাহাকার.... হাহাকার
চারিদিকে শুধুই মৃত্যুর হাহাকার।।
আকাশ - বাতাস আজ ঢেকেছে,
এক ক্ষুদ্র ভাইরাসের কালো ছায়ায়।।
জানালা খুললে আজ
নেই কোনো পাখির কলরব,
শুধুই অ্যাম্বুলেন্স এর আওয়াজ।।
করোনা তুমি কাড়ছো অনেক প্রাণ,
তাই আজ বিদ্ধস্ত সবার মন প্রাণ।।
তুমি এনে দিয়েছো লকডাউন,
বাড়িয়ে দিয়েছো সামাজিক দূরত্ব,
শিখিয়ে দিয়েছো অনেক অনেক স্বাস্থ্যবিধি।
আজ মানুষের মুখ ঢেকেছে
কতই না রকমারি মাস্কে।।
ছিনিয়ে নিয়েছো অনেক কাজ,
বাড়িয়ে দিয়েছো বেকারত্ব।।
কলকারখানার দূষণ থেকে
আমাদের করেছো মুক্ত।
কারও মুখে নেই কোনো
ঈশ্বর, আল্লাহ-র নাম,
শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছে
ডাক্তার নার্সের জয়গান।।
মানুষরূপী ঈশ্বরের সাথে
করিয়ে দিয়েছো সাক্ষাৎ।
ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীকে
চিনিয়ে দিয়েছো নতুন রূপে।।
আমরা লড়বো.... আমরা জিতবো....
করোনা ভাইরাসের থেকে জিতব।
হাতে হাতটি ধরবো সবাই
করবো করোনা জয়।।

হারানো স্মৃতি

রিমা কর্মকার
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

হারিয়ে গেছে কত কিছু
ব্যাগ, কলম, ছাতা
ছোটো বেলার রঙ পেনসিল
নীলচে ড্রইং খাতা।
হারিয়ে গেছে কত স্বপ্ন
হাতে লেখা চিঠি,
হারিয়ে গেছে ছুটির দুপুর
আর পড়তে বসার ঘর,
সাত সাগর আর তেরো নদী
ধূ ধূ তেপান্তর।
হারিয়ে গেছে লুকিয়ে থাকা
মধুর অনেক তিথি
মনের মাঝে রইল গাঁথা
হারানো দিনের স্মৃতি।।

নারী ও সমাজ

তনুশ্রী মণ্ডল
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

এহেন কালে বলিতে কী পারো? সমাজ গড়িবার তরে।
কাহার অবদান অধতরে ও গো কে বা উচ্চশিরে ॥
সমাজ, সমাজ, সমাজ করিয়া, মাতিয়া উঠিয়াছে বিশ্ব।
সমাজ গড়িবার আসল কারিগর সেই যে আজ নিঃস্ব ॥
বলিতে পারো কী? সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টির কে বা মূল।
সৃষ্টিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ শিখা শ্রেষ্ঠ নারীকুল ॥

মানো কী তবে নারী কী শুধু মেটায় কামের ক্ষুধা?
নারীকে দিলে অগ্রাধিকার নারীও দেবে সুধা ॥
পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আজ নারীরা হইয়াছে জব্দ।
সুশৃঙ্খল জীবনধারা সমাজে হইয়াছে স্তব্ধ ॥
উচ্চশির মানবজাতির আজ হইয়াছে দুর্গতি।
ফিরিবেনা কী? ও হে মানব, তোমাদের সুমতি ॥
অদ্যকালে শিউড়ে উঠি, দেখিয়া সমাজ ব্যবস্থা।
মনরে বলি হায়রে মন নারী কী এতই সস্তা ॥
অসহায়িত্ব পিছু ছাড়েনা যেমনি পক্ষীকুলে।
নারীরাও কী ভাসবে শুধু চক্ষু ভরা জলে ॥

নারী

রাজিয়া সুলতানা
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

আমি নারী
আমার স্বপ্ন দেখা বারণ ।
শুনতে হয়....স্বপ্ন?
সে তো নিছক কল্পনামাত্র।
তবুও, কল্পনার জগতে ইচ্ছে করে.. দূরে কোথাও হারাতে,
ওই নীল আকাশের পাড়ে
পাখি হয়ে উড়ে যেতে।
মানুষ ভুলে যায়...
নারী কখনও কন্যা, কখনও জননী, কখনও বা অসুরবোধনকারিণী।
আমি নারী...
আমি যেতে পারি মহাকাশে,
ঠিক তেমনই পারি সংসার সামলাতে।
একটাই আত্মবিশ্বাস....
প্রতিবাদের প্রবল ঝড়ে,
নতুন সকাল আসবে ফিরে
ঠিক সেই নারীর হাত ধরেই।

হয়তো কখনো স্বপ্ন সত্যি হবে,
পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী পারবে সোজা হয়ে দাড়াতে,
কলম হাতে সকলকে যোগ্য জবাব দিতে।

স্মৃতি

কুলসোম খাতুন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

লিখেছি চিঠি তাহার নামে
স্মৃতি দিয়ে এঁকে'।
'তপ্ত কঠিন হৃদয় ভেঙে
রয়েছে আমার মাঝে'।
'চোখের জল বাঁধনহারা
শুধুই মনে ব্যথা'।
'ভাবছি আমি চলে যাবো
কিন্তু এই স্মৃতি যেতে দেয় না'।

'শত ব্যথা দুঃখেও কিন্তু
জীবন থেকে স্মৃতি চলে যায় না'।
'এই স্মৃতিই আবার বাঁচতে শেখায়'
'দেখায় নতুন ভোরের আলো'।
'স্মৃতিকেই আঁকড়ে আমরা
যাই সব দুঃখ ব্যথা ভুলে'|
'কঠিন বাস্তবতার সামনে এলে
স্মৃতিই হয়ে দাঁড়ায় জীবনের চরম বাধা'।
'এই পৃথিবীর সব কিছু ভুলে থাকলেও
আমরা স্মৃতিকে ভুলতে পারিনা'।
'মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও
রেখে যায় তার সমস্ত স্মৃতি'।

A Pledge To Take

Basabdatta Roy
Education Department

Look at the earth crying
Crying, because it remembers those golden days
When it's atmosphere was pure and it's water was fresh!
Look at the earth crying
It's that earth whose love is as clean as a mother's love...
Look at your mother, who is crying for its water and this is filled by your shitty waste, the poisons that your industries continue to produce.

The earth is crying as it is no more capable to perceive the stars shining in the sky!
Oh! Do you ask why?
It's because the air is filled with your moments of freedom
The moment when you take a trip to the nearest distance by your beloved vehicle.

Please stop demolishing nature for your dirty needs
Because everyone has to recompense for his deeds
Understand the love you got from your mother earth
It's high time to return some love and respect
Because this is just what the least SHE expects!!!!

পণপ্রথা ও বিপন্ন নারী সমাজ

ফুলেশ্বরী খাতুন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এমন কিছু কুপ্রথা রয়েছে যা সমাজে নারীর জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। এসব কুপ্রথার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল পণপ্রথা। পণপ্রথা হল বহুচর্চিত ও অমীমাংসিত একটি সমস্যা যা তুলে ধরে আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সবচেয়ে কলঙ্কময় দিক হল পণপ্রথা।এই কুৎসিত জঘন্যতম প্রথা কত নারীর প্রাণ হরণ করেছে,কত নারীর জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ।

পণপ্রথা বলতে বোঝায় এমন এক ঘৃণ্য প্রথাকে যেখানে কনেপক্ষ বরপক্ষকে অর্থ প্রদান করে বিয়ের ব্যবস্থা করে। বর্তমানে আমরা শিক্ষাদীক্ষায় সভ্যতায় আজ অনেক এগিয়ে কিন্তু দুঃখের বিষয়, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের সমাজে পণপ্রথার মতো জঘন্য কাজ চলছে এখনো। বিয়ে হল একটি মধুর সম্পর্ক সেই সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই শুরু হয় দেনা পাওনার দর কষাকষি। শুধু তাই নয় নতুন বউয়ের গুণাগুণের মূল্যায়ন নির্ভর করে পণ অর্থাৎ যৌতুকের ওপর।

এই প্রথা এমনই এক প্রথা যা আজকের সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিত - অশিক্ষিত ধনী- দরিদ্র হিন্দু-মুসলিম সকল ধর্মের সকল শ্রেণীর নারীর জীবনকে ঠেলে দিতে পারে দুঃখ দুর্দশার অতলান্তিক সাগরে। আজ আমরা টেলিভিশনের পর্দায় অথবা খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই 'গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু' শীর্ষক সংবাদ । আর এই মৃত্যু সংবাদের প্রায় প্রতিটির নেপথ্যেই প্রধানতম কারণ 'পণপ্রথা' । এইভাবে পণপ্রথা উদ্ভবের সময় হতে আজ পর্যন্ত অসংখ্য নারী পণপ্রথায় বলী হয়েছেন।

প্রাচীনকাল থেকে বতর্মানকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর ওপর অত্যাচার , নির্যাতন জারি রয়েছে। বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক, ধর্ম প্রবর্তক, মানবতাবাদী মহাপুরুষদের বাণী গুলি যদি আমরা মেনে চলতাম তাহলে হয়তো আমাদের সমাজ থেকে এই নির্লজ্জ অমানবিক প্রথা সময়ের সাথে বিলীন হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কিছু মানুষের অশিক্ষা স্বার্থবুদ্ধি আর অপরিসীম লোভ আজও টিকিয়ে রেখেছে পণপ্রথার মতো কুৎসিত জঘন্যতম প্রথাকে।

এই অমানবিক প্রথা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যাঁদের একান্ত কামনা ' আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ' আর এই বাসনা পূরণ করতে পাত্র পক্ষের দাবি মেনে নিয়ে কন্যার জন্য সুপাত্র হাত ছাড়া করতে চান না কোনো পিতা-মাতা। কোনো পিতা-মাতাই হয়তো পাত্র পক্ষের সাধ্যাতীত দাবীকে 'হাতে হাতে' মিটিয়ে দিতে পারেন না। আর তখনই শুরু হয় পাত্রীর ওপর পাত্রপক্ষের অমানবিক অত্যাচার যার বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করে গেছেন তাঁর নিরুপমা চরিত্রের মাধ্যমে। নিরুপমা শেষপর্যন্ত

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার অত্যাচারিত লাঞ্চিত দুর্বিষহ জীবন থেকে চিরমুক্তি লাভ করেছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে গ্রাম বাংলার প্রায় প্রতিটি গৃহেই এক একজন নিরুপমাকে প্রতিনিয়ত পণপ্রথার শিকার হতে হচ্ছে। পরিমাণমতো দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্রোধে উন্মত্ত শ্বশুরবাড়ির লোকজনের হাতে প্রাণ চলে যায় অসংখ্য নারীর। এছাড়াও আমরা দেখতে পাই যে অসহায় দরিদ্র পিতার কন্যারা নিরুপায় হয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আবার কেউ কেউ নিজেদের পিতাকে স্বস্তি দিতে বেছে নেয় জীবনের চরম পরিণতিকে। আমাদের হৃদয় আজ বেদনার্ত ও প্রতিবাদী হয় কিন্তু সমাজের শক্তিশালী নির্মম এই প্রথার সামনে লক্ষ লক্ষ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ন্যায় আমরাও আজ অসহায়।

একটি বিষয় যেটি আমাদের সকলকে ভাবিত করে বা করা উচিত সেটি হল পণপ্রথার মতো নিকৃষ্টতম প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শুধুমাত্র পাত্রপক্ষই কী দায়ী?

সমগ্র নারী ও তাদের অভিভাবকরাও এর জন্য দায়ী পরোক্ষভাবে। এই কুপ্রথার অবসানের জন্য সমগ্র নারী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে,ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তাদের অভিভাবকদেরও । কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাই পুরোপুরি উল্টো চিত্র। একটি সুচাকুরে পাত্র পেলে পাত্রীপক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়,আর তখনই নিলামে দাম বাড়ানোর মতো নিজেদের চাহিদকে বাড়িয়ে দেয় তথাকথিত সুপাত্রের দল। বর্তমানে পণপ্রথা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরায় শিরায়। বিত্তবান কন্যাপক্ষ যৌতুক দেওয়াকে সামাজিক মর্যাদার সূচক বলে মনে করেন। বর্তমানে আমাদের সমাজের এমন অবস্থা যেখানে কোন পাত্র বিনা পণে স্ব-ইচ্ছাই বিবাহ করতে চাইলে জনসমাজে তাকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় | বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এটাই বাস্তব রূপ | কাজেই একটা দিক স্পষ্ট যে পণপ্রথার মতো নির্মম প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য দায়ী শুধুমাত্র পাত্র পক্ষই নয় দায়ী পাত্রী পক্ষও |

আজ আমরা আধুনিক যুগের নাগরিক ব'লে গর্ববোধ করি | আজকের নারী পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজেদের নিয়োজিত করেছে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য | কিন্তু সমাজের এমন নিকৃষ্টতম প্রথার অবসান ঘটাতে আমরা কেউ সচেষ্ট হচ্ছি না | আর সেই কারণেই একুশ শতকের ডিজিটাল ভারতে বসবাস করেও আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে ' কন্যাভ্রূণ হত্যা', ' আঁতুর ঘরে জীবন্ত কন্যাসন্তান পুঁতে ফেলার ' মতো ঘটনা । কাজেই এই প্রথাকে দূরীভূত করতে আমাদের সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলনের ডাক ছড়িয়ে দিতে হবে । আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটি নারীকে লেখাপড়া শিখে নিজেদের সামাজিক মূল্য ও মর্যাদা অর্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভরশীল হতে হবে । এভাবেই আমাদের সমাজ থেকে পণপ্রথার মতো বিষাক্ত ক্ষতের যন্ত্রণা ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে পড়বে। নারী ও পুরুষ সমাজ নামক পাখির দুটি ডানা। দুটোকেই সমানভাবে সচল হতে হবে। আর এভাবেই শুধু পণপ্রথা নয় সমাজের সকল ব্যাধি দূর হবে গড়ে উঠবে আদর্শ মানবসমাজ। আর আমরা যদি সমাজ থেকে পণপ্রথার মতো নিষ্ঠুর প্রথাকে নির্মূল করতে পারি তবেই পণপ্রথায় বলি সমস্ত অসহায় নারীর অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই সেই লক্ষ লক্ষ নারীর আত্মার শান্তি কামনায় আমাদের একটাই স্লোগান হবে " আমরা পণ দেবো না, পণ নেবো না" ।

মাধবী ও তার পাখি

কৃপাময়ী দে
ইংরেজি বিভাগ

গ্রামের মেয়ে মাধবী বড়োই শান্ত ও লাজুক প্রকৃতির তবে কাউকে একবার মনে ধরলে তাকে আপন করে নেয়। সে পশুপাখি খুব ভালোবাসে। বাড়িতে তার বাবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। বাড়িতে কোনো খেলার সাথী না থাকায় তার খুব মন খারাপ হয়। তাই মেয়ের মন ভালো করার জন্য একবার শীতকালে মাধবীর বাবা একটি বাচ্চা চন্দনা টিয়া এনে দেয়। শীতকালেই চন্দনা টিয়ার জন্ম হয়। পাখিটিকে পেয়ে মাধবী সত্যিই ভীষণ খুশি হয় আর ওর নাম রাখে মিঠু।

মিঠু অনেকটাই ছোটো, তার গায়ে অনেক জায়গায় এখনও পালক ওঠা বাকি। সে খাওয়ার সময় হাঁ করা ছাড়া আর কিছুই শেখেনি। ঠান্ডার থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে মোটা কাগজের একটি বাক্সের ভিতর রাখা হয়। বাক্সের মুখটা খোলা থাকে বাকি চারপাশ কম্বল দিয়ে ঘেরা থাকে। দিনে চারবার মিঠুকে চামচে করে খাইয়ে দিতে হয়। রোজ মাধবী তাকে খাওয়ানোর আগে বাটিতে চামচ দিয়ে খাবার গুলতে গুলতে "মিঠু খাবে মিঠু খাবে" বলে ডাকতে থাকে। মাধবী সবসময় তার আদরের পাখিটিকে চোখে চোখে রাখে, সময় মতো খাওয়ায়, ওর সাথে খেলা করে, কথা বলা শেখায়। মাত্র এগারো বছরের মেয়ে হলেও তার ভিতর মাতৃত্ব জেগে ওঠে। মিঠুকে না খাইয়ে সে খায় না, শীতে যাতে কষ্ট না পায় সেদিকে খেয়াল রাখে। ওর নিজেকে নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেয়, সব চিন্তা মিঠুকে নিয়ে। যেন মাধবীর জীবনটাই মিঠুকে ঘিরে।

ধীরে ধীরে মিঠুর গায়ে পালক ভরতে শুরু করে, এখন একটু একটু ওড়ার চেষ্টা করে কিন্তু উড়তে পারে না। বাটি চামচের শব্দ পেলেই ডাকাডাকি শুরু করে বুঝতে পারে তাকে এখন খাওয়ানো হবে। এমনকি "মিঠু খাবে" বললেও কথাটা শুনে বুঝতে পারে তাকে খাওয়ানো হবে। দিনের অনেকটা সময় মাধবীর কাঁধে বসে থাকে। মাধবী এখন ভীষণ খুশি, এখন আর তার নিজেকে একা লাগে না নতুন খেলার সাথী পেয়ে। মিঠুর কখন খিদে পায়, খিদে পেলে কেমন করে ডাকে, কোথায় বসে থাকতে ভালোবাসে সবকিছুই সে বুঝতে পারে। মিঠু মাধবীর কাছে থাকতে সবথেকে বেশি ভালোবাসে এটা জেনে তার খুব ভালো লাগে। মাধবীর বাবা মাও মিঠুকে ভীষণ ভালোবাসে, সে বাড়ির সকলের খুব আদরের। মিঠু তরল খাবার ছাড়া আর কিছু খায় না তবুও মাধবীর বাবা পেয়ারা, আপেল আনে তাকে খাওয়া শেখানোর জন্য। মাঝে মাঝে পাড়ার লোকও মিঠুকে দেখতে আসে। সকলে খুব আশা করে আছে কবে মিঠু কথা বলা শিখবে।

প্রতিদিনের মতোই একদিন সকালে মাধবী খোলা বারান্দায় বসে মিঠুকে খাওয়াতে থাকে তখনই হঠাৎ মিঠু চোখের পলকে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে চলে যায়। মাধবী হতভম্বের মতো বসে ভাবতে থাকে এত

ভালোভাবে কবে মিঠু ওড়া শিখল। তারপর সে যেদিকে মিঠু উড়ে যায় সেদিকে ছুটে যায়। সমস্ত গাছপালা তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি করে কিন্তু কোথাও তার দেখা মেলে না।সবাই মিলে পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি করে। সন্ধ্যা নামার আগে পর্যন্ত সকলে মিলে খুঁজলেও মিঠুর কোনো দেখা মেলে না। মাধবী কান্নায় ভেঙে পড়ে। মাধবীর মা বলে পাখিরতো আসল বাসস্থান বন সেখানেই সে সব থেকে ভালো থাকবে। সে নিজের ইচ্ছে মতো ডানা মেলে উড়তে পারবে। তার মা আরও তাকে বলে মিঠুকে সত্যি করে ভালোবাসলে তাকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেখেই তুমি খুশি হবে। তবে মাধবী কিছুতেই বুঝতে চায় না। তার চিন্তা হল মিঠু এখনও একা খেতে শেখেনি, কি করে সে খাবে, ওকি একা খাবার খুঁজে খেতে পারবে, এই শীতে কি করবে, কোথায় থাকবে। এসব ভেবে সারা রাত দুচোখের পাতা এক করতে পারে না মাধবী। মিঠুর স্মৃতি তাকে খুবই কষ্ট দেয়। মিঠুই ছিল তার খেলার সঙ্গী তাকে ছাড়া মাধবী কীভাবে থাকবে। মাধবীর বাবা মাও কষ্ট পায় কিন্তু মেয়ের কষ্ট বাড়বে বলে তারা প্রকাশ করে না। তারা অনেকভাবে মাধবীকে সান্ত্বনা দেয় কিন্তু কিছুতেই তার মন ভালো হয় না। তার বাবা বলে আরেকটা পাখি এনে দেব। মাধবী আরেকটা পাখি চায় না, সে মিঠুকেই চায়। যাকে সন্তানের মতো ভালোবেসে নিজে হাতে বড়ো করেছে তাকে ভোলা কি অতই সহজ।

ফিরে পাবার কোনো আসা নেই জেনেও পরেরদিন সকালে আরও একবার খুঁজতে যায় মাধবী, এবার সে সঙ্গে করে নিয়ে যায় মিঠুর খাবার। সে বাটি-চামচে আওয়াজ করে আর 'মিঠু খাবে মিঠু খাবে' বলে ডাকতে থাকে। তাদের বাড়ির চারপাশে যত বন ছিল সব জায়গায় যায় কোথাও বাকি রাখে না খুঁজতে। আর যাকে পায় তার কাছেই জানতে চায় কোথাও টিয়া পাখি দেখেছে কিনা। তারপর মিঠু যেদিকে উড়ে গেছিল সেদিকে যায় এবং একই ভাবে বাটি-চামচে শব্দ করে আর মিঠু মিঠু বলে ডাকে। হঠাৎই মিঠু বাটি-চামচের আওয়াজ পেয়ে সাড়া দেয়। সে নিম গাছের ডালে বসে ছিল। মাধবী আরও জোরে আওয়াজ করে আর ডাকতে থাকে। মিঠুও খিদের জ্বালায় নীচে নেমে আসে। মাধবী তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে পেট ভরে তাকে খাইয়ে দেয়। মাধবী যেন তার জীবন ফিরে পেল, নিমেষেই তার সব দুঃখ কোথায় যেন বিলীন হয়ে যায়। বাড়ির সকলেই খুবই আশ্চর্য হয় আর তার সাথে খুশি তো হয়ই। এই একদিনেই মাধবী বুঝতে পারে মিঠুকে ছাড়া সে থাকতে পারবে না।

মিঠুকে ফিরে পেয়ে খুব আনন্দে দিন কাটতে থাকে। এর প্রায় দুই মাস পর মিঠু দানা খেতে শিখে যায়। সে ছোলা, ভুট্টা, পেয়ারা, লংকা খাওয়া শিখে গেছে। গরম পড়তে শুরু করেছে। মিঠু জানলা দরজা বন্ধকরা ঘরে থাকে। ঘরের ভেতরই উড়ে বেড়ায়। এমনকি "মা" বলতেও শিখে গেছে তবে ওই একটামাত্র কথাই বলতে পারে। মাধবী ঘুম থেকে উঠে মিঠুর কাছে যায়, তাকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তারপর তাকে নিজের কাঁধের ওপর বসিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে যায়। শেষ বারের মতো মিঠুকে ভালোভাবে দেখে তাকে খোলা আকাশে মুক্ত করে দেয়।

Science Behind Holding A Pen or Pencil Properly

Shreya Bhattacherjee
Department of Education

Introduction: In today's world everything is going to be digital but once in life everybody should learn how to hold the pen or pencil in his/her childhood. For instance, consider a scenario where you have to teach someone to hold the pen or pencil properly in order to write smoothly with a good quality hand writing along with a good writing speed. In this article, I tried to explain the science behind to hold a pen/ pencil properly.

Here I discussed some of the key points: Hold the pen/ pencil with 3 finger thumb, index and middle finger of your using hand with calmly not too much force on it but hold properly.

Pen/ pencil guide in between index and thumb.

Grip the pen/ pencil 2-3 cm from tip or not to much closer to the tip and not too far from the tip.

Now I am discussing point no 3 with some sketches. This is the most important for quality writing along with proper writing speed.

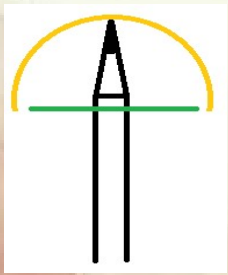
Figure 1

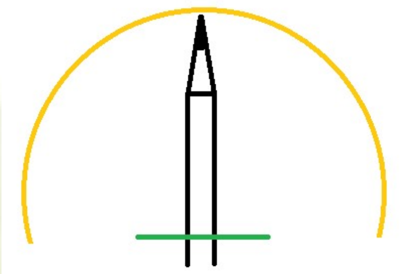
Figure 2

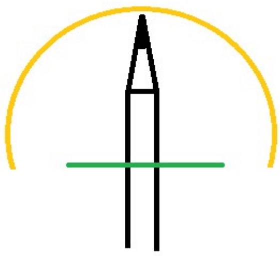
Figure 3

Now just see in figure 1, 2, 3 where green line is assume to be the grip and yellow line is the maximum possible arc length drawn to hold that grip without pick up or change the hand position from page/ board, here we saw that arc length is minimum in figure 1, because grip is small or we say that without change our hand position we can write small words. In case of figure 2, we saw that arc length is maximum because of its grip length is maximum so here we said that without change of hand position we can write more words than 1st case. In case of figure 3 here arc length is in between 1st and 2nd case so we can write more than 1st case but less than 2nd case because grip length is in between 1st and 2nd.

Conclusion: After see the all possible three case we can conclude that 2nd case is most preferable but if grip distance is increase then balance to handle the pen/ pencil will less. In 1st case balance is more but speed is less because without change hand position we can write less number of words. Hence, most suitable case is the 3rd one where balancing is in between 1st and 3rd so quality of writing is good along with writing speed.

সাহসী কাঠবেড়ালি

তৃষা বিশ্বাস
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

ছায়া ঘেরা গ্রামের এক বট গাছের কোটরে বাবা মার আদরে বেড়ে উঠেছে এক কাঠবেড়ালি ছানা। বাবা ওকে বলে জানিস কাটু, সীতাদেবী উদ্ধারের পিছনে আমাদের পূর্ব পুরুষের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।-কী ভূমিকা বাবা? কাটু প্রশ্ন করে। রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনে নুড়ি-পাথর বহন করে রামচন্দ্র কে সাহায্য করেছিল। বাবার মুখে পূর্বপুরুষের বীরত্বের কাহিনী শোনার পর কাটু ভাবলো তাকেও কিছু করতে হবে। শুধু পুটুস -পাটুস লেজ উচিয়ে খেয়ে বেরিয়ে আর খেয়ে ঘুমিয়ে থাকার নাম জীবন নয়। বর্ষার আগে বাবা আর মা খাদ্য সঞ্চয়ে ব্যাস্ত। সেই সুযোগে কাটু এ -পাড়া ও -বেড়াতে লাগল। হঠাৎ ওর চোখ গেল এক গৃহস্তের উঠোনের উপর আম গাছের এক ডালে। সেখানে সবুজ একটা টিয়া পাখি খাঁচার মধ্যে বসে গুমোচ্ছিল। টিয়াকে লক্ষ করে কাটু বলল, ওরে টিয়ারানি খাঁচার ভিতরে বেশ তো আছো। কী যে বলো ভাই কাটু। বন্দি দশা কি কারো ভালো লাগে? টিয়া কাটুকে বলল। কেন খাবার সংগ্রহের চিন্তা নেই, বাসা তৈরির হ্যাপা নেই, তোমার তো আনন্দে দিন কাটাবার কথা। দেখ ভাই দূর থেকে দেখে আমাকে সুখী মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে আমি মৃত প্রায়। সেই কবে নিজের আত্মীয় -পরিজন থেকে আলাদা। খোলা প্রকৃতির কোলে ডানা মেলে ওড়ার স্বাদ টাই আলাদা। টিয়া কাঁদতে লাগলো। কেঁদোনা সব ঠিক হয়ে যাবে। কী করে হবে? তোমার দেশের বাড়ি কোথায়? কাটু জিজ্ঞেস করল। চূর্ণী নদীর ধারে তিনটে মন্দির আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু চূড়াটায় অনেক গুলি কোটর আছে। সেই কোটরের মধ্যে আমাদের আত্মীয় -পরিজনরা সব বাস করে। তা তুমি এখানে এলে কী করে? এক ব্যাধ কঞ্চির ডগায় আঠা মাখিয়ে আমাকে ধরেছিল। তার পর আমার ঠাঁয় হলো এ বাড়িতে। আমি তোমার বাড়িতে খবর দেবো, তুমি, তুমি তো খুব ছোট।তুমি কী পারবে সেখানে যেতে? টিয়ার গলায় উৎকণ্ঠা। আমার পূর্বপুরুষেরা খুব সাহসী। আমারো। কাটু তখন রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনের কথা তুলে ধরলো। তবু ও পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। নিজের দিকে খেয়াল রেখো, বিদায় টিয়ারানি। তুমিও ভালো থেকো। পর দিন খুব সকালে কাঠবেড়ালি কোটর থেকে বেরিয়ে এলো।সবে সূর্য উঠেছে,পাখ পাখালির কূজনে মুখর হয়ে উঠলো প্রকৃতি।

কাটু এ গাছ সে গাছ নাচতে নাচতে পিচ রাস্তায় নেমে এলো। একটা শালিক পাখি খাবার খুঁজতে ব্যাস্ত, কাটু তাকে বলল -শালিক পাখি শালিক পাখি বলতে পারো ভাই চূর্ণী নদীর ধারে যাবো রাস্তা জানা নেই। সূর্য বরাবর পাকা রাস্তা ধরে গেলে সামনে একটা ব্রিজ পড়বে। ওই ব্রিজের নীচে দিয়ে চূর্ণী নদী বয়ে চলেছে। কাটু নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে গেল। আকাশে তখন লাল সূর্য মিটিমিটি হাসছে, টলটলে নদীর জল ছলাৎ ছলাৎ বয়ে চলেছে। দু একটা জেলে তখন নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে ব্যাস্ত। কিন্তু এবার কোন দিকে যাবো পুবে না পশ্চিমে? কোথায় দেখা পাওয়া যাবে তিন মন্দিরের চুড়ো, এরকম যখন ভাবছে তখন একটা পানকৌড়ির দেখা পেলো সে। জিজ্ঞেস করল পানকৌড়ি বলে দেবে আমায় তিন মন্দিরের চুড়ো কোথায় গেলে পায়? পানকৌড়ি প্রথমে কাটুকে পাত্তা দেয় নি, কিন্তু টিয়া পাখির ব্যাথা ভরা কাহিনী শোনার পর ওর হৃদয় বিগলিত হলো এবং বলল -কাঠবেড়ালি বন্ধু, তুমিও ওঠো আমার কাঁধে তিনটি চূড়ার মন্দিরেতে যাবে খানিক বাদে। কাটুকে পিঠে চাপিয়ে পানকৌড়ি অনেক কষ্টে মন্দিরের কাছে পৌঁছে দিলো। কাটু তো দেখে অবাক, সবচেয়ে উঁচু মন্দিরের চূড়তে অসংখ্য গর্ত। আর গর্তের ভিতরে টিয়া পাখির রহস্য। সে চুড়োতে উঠতে লাগলো দেখে সদ্দার গোছের একটা টিয়া চোখ লাল করে জিজ্ঞেস করল, দেখিনি তো ভাই তোমায় হেথা, কোথা থেকে তুমি এলে। আমাদের থানে ঠাঁই পাবে নাক তুমি, এখুনি চলে যাও। কাটু তখন সব কথা খুলে বলল টিয়া দলপতিকে। তখন টিয়ার দল সব ডাকলো। ঠিক হলো আজ নয়, কাল খুব সকালে বেরিয়ে পড়া যাবে। রাতে কাটুকে সবাই খুব আপ্যায়ন করলো ওরা। খেতে দিলো ধান আর ছোলা। থাকতে দিলো নিজেদের বাসায়। সকালে প্রায় পঞ্চাশটা টিয়া পাখির দল উড়ে চললো কাটুদের গ্রামে। এবারে কাটু নদীর পার ধরে দৌড়ে দৌড়ে চলল। ওকে অনুসারণ করল টিয়ার দল।

কাটুদের গ্রামে যখন পৌছালো সূর্য তখন মধ্য গগনে। টিয়ারানি সবে মাত্র খাঁচায় বসে দানা খেতে শুরু করেছে, অমনি তারা সকলে শুরু করল তারস্বরে চিৎকার। বন্দি টিয়ারানির চোখ ফেটে জল এলো। এতো দিনে সাথী সঙ্গী দের দেখা পেলো। এবার বোধহয় বন্দি দশা থেকে মুক্তি ঘটবে। টিয়া সদ্দার এগিয়ে এসে ঠোঁট দিয়ে খাঁচার আগল দিলো খুলে। গৃহস্থ তখন হাঁ করে দেখছে টিয়াবাহিনীর কাজকর্ম। এতো গুলো টিয়াপাখি দেখে বেচারি এগোনোর সাহস পেল না। কৃতজ্ঞতা জানাতে টিয়াবাহিনী এলো কাটুর বাবা -মায়ের কাছে। অসাধারণ ছেলে আপনাদের, ওর জন্যই খুঁজে পেলাম আমাদের মেয়েকে। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ কিছু বনফুল আর কাঠবাদাম দিয়ে গেলাম। বলল টিয়াবাহিনীর সদ্দার। টিয়ারানী তখন খুশিতে ডাগমোগো হয়ে খোলা আকাশে ডিগবাজি খেলো। তারপরে কাটুকে বলল - গল্প হলেও মিথ্যে তো নয়, রামায়ণের ঘটনা সাহস দিয়ে করলে নতুন মহাকাব্য রচনা। বিদায় বেলা টিয়ার লাল চঞ্চু কাটুর ঠোঁট স্পর্শ করল।

বন্ধু

সুদীপ্তা সাহা
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

বন্ধু সবার জীবনে থাকে। কিছু কিছু বন্ধু থাকে যারা শুধু ক্লাসমেট। আর কিছু কিছু বন্ধু থাকে যারা ছোট থেকে এখনো পর্যন্ত স্থায়ী। সবার জীবনে বন্ধু থাকে কিন্তু সেরা বন্ধু তাদেরই থাকে যারা ভাগ্যবান। সেরা বন্ধুর (বেস্ট ফ্রেন্ড) কাছে কোনো কিছু লুকানো যায়না সমস্ত কথা কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলা যায়। যার কথা আনন্দে দুঃখে সব সময় মনে পড়ে তাদেরই সেরা বন্ধু বলে থাকি। সেরা বন্ধু জীবনে থাকা খুব প্রয়োজন একটি ব্যক্তি। সেরা বন্ধুর সাথে অন্য কিছুর তুলনা করা যাবেনা সেটা একটা আলাদা অনুভূতি যাকে ছাড়া তোমার জীবনটাই অসম্পূর্ণ।

কিন্তু কতজন আছে যারা বন্ধু শব্দটা মূল্য, বিশ্বাস দিতে পারেনা। তারা শুধু শুধু বন্ধু হয়ে থাকে ভালো বন্ধু কোনোদিন হতে পারে না।

সেরা বন্ধু তোমার বিপদে-আপদে সব সময় পাশে থাকবে কখনো ভুল পথে গেলে বাধা দেবে ,সব সময় ছায়ার মতো সাথে থাকবে। সেরা বন্ধু পদবি পাওয়া সহজ না সেরা বন্ধু হতে গেলে অনেক দায়িত্ব, অনেক বিশ্বাস ,অনেক অনুভূতি ,অনেক আশা, সমস্ত কিছু জড়িয়ে থাকে।

একটা ছেলে ও মেয়ে দুজনে সেরা বন্ধু হতে পারে কিন্তু বর্তমান সমাজ সেটাকে অন্যভাবে দেখে এই বর্তমান সমাজের জন্য সেই অন্যভাবে দেখার প্রভাব ওই সেরা বন্ধু দুটোর বন্ধুত্ব কলঙ্কিত করতে পারে। সমাজ মানতেই পারে না যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ভালো বন্ধু অর্থাৎ সেরা বন্ধু হতে পারে।

একজন সেরা বন্ধু জীবনে যে কতটা প্রয়োজন - যার নেই সেও বোঝে, যার আছে সেও বোঝে।

সবাই সেরা বন্ধু হতে পারেনা। কিছু কিছু জন বন্ধু চিনতে ভুল করে, ঠিক চিনতে ভুল করে না ! তাদের বিশ্বাস ভাঙে কারণ তারা যাকে সেরা বন্ধু ভেবেছিল সে আদৌ তাকে সেরা বন্ধু হিসেবে দেখিনি সেটা সে বুঝতে দেরি করেছে। হয়তো সে তাকে সেরা বন্ধু ভেবেছিল কারণ তার গুরুত্ব সেই বন্ধু প্রথম প্রথম দিয়েছিল দিন যেতে যেতে গুরুত্ব কমে আসে। সেরা বন্ধুর কাছে কখনো গুরুত্ব কমে না।কিন্তু যখনই আমরা কাউকে সেরা বন্ধু হিসাবে মনে করি তার ওপরে একটা আলাদা অনুভূতি তৈরি হয় তারপর যখন দেখা যায় যে তার অনুভূতি আশা বিশ্বাস গুরুত্ব সেই সেরা বন্ধুর কাছে কোন মূল্য নেই। তখন নিজেকে খুব একা মনে হয়।

কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের বন্ধু একটা সময়ের পর থাকেনা তারা চায় না নতুন করে বন্ধু করতে কারণ তারা আগে যাদের সেরা বন্ধু বলে ভেবে এসেছিল সেই বন্ধুগুলো তার বিশ্বাস ভেঙেছে সেই জন্যই আজ তার কোনো বন্ধু নেই সে একা থাকতে চায়।

একা থাকতে না চাইলেও পরিস্থিতি তাকে একা করে দেয় সে চাই বিশ্বাস করতে কিন্তু সেই বিশ্বাস কেউ রাখতে পারেনা।

সবার ভাগ্যে সেরা বন্ধু থাকে না আর সবাই সেরা বন্ধু হতেও পারে না । বন্ধু নিয়ে কথা বললে সে কথা শেষ হবে না কারণ বন্ধুত্ব এমনই একটা জিনিস। বন্ধুত্ব সম্পর্কে অনেক ইমোশান জড়িয়ে আছে যেগুলো সবাই মূল্য দিতে পারে না। সব শেষে বলতে চাই বন্ধু তুই ভালো থাকিস।সারাজীবন খুশি থাকিস।

ভোলু

মারিয়াম খাতুন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

কনকনে শীতের রাত। খানিকক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। মাঝে মাঝে হালকা হাওয়া এসে শীতটাকে সূচের মতো গায়ে বিধিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। বড়দিদি এক মনে পড়া করছে বারান্দাতে বসে । মেজ দিদি ও ছোট বোন কাটাকুটি খেলছে। কিছুদিন আগেই পাশের বাড়িতে একটা বৌ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ফলে বাড়িতে একটা ভয়ের আমেজ তৈরি হয়ে আছে। আর সেই বিষয়েই গল্প করছিলাম আমি আর পাশের বাড়ির মাসুদিদি । বিড়াল টা মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকিয়ে ম্যাও ম্যাও করে উঠছে। মা আর কাকি পাশের পাড়াতে এক আত্মীয়ের বাড়ি গেছে । মাসুদিদি গল্প করতে করতে হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়তে বাড়ি চলে গেল ।

তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের দিকে চলেছে। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া তেমন কিছু আওয়াজ নেই। গরুটা মারা যাবার পর থেকে ভোলু মানে আমাদের কুকুর টা কেমন যেন হয়ে গেছে। প্রতি দিন আমাদের কাছে বসে থাকে। আজ তারও পাত্তা নেই দেখছি। আকাশে একটাও তারা নেই। সবই যেনো কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যা শীত পরেছে, সবাই বুঝি লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে।

হঠাৎ দেখি মাসুদিদি দৌড়াতে দৌড়াতে ভয়ার্ত মুখ নিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। ওর মুখ ভয়ে নীল হয়ে গেছে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। কিছু বলতে পারছেনা। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে মাসুদিদি বলল ওদের হেঁশেল ঘরের ভিতরে কি একটা আছে জোরে জোরে দরজা নাড়িয়ে যাচ্ছে এবং গুড়গুড় চাপা আওয়াজ করছে । হেঁশেল ঘরের দরজা তো কাকিমা বন্ধ করেছে বিকালে, এখোনো বন্ধ আছে তাহলে ভিতরে কি! এতক্ষণে ছোটবোন, মেজ দিদি ও বড়দিদি সবাই আমাদের কাছে চলে এসেছে। আমরা মাসুদিদির কথা বিশ্বাস না করে নিজের চোখে দেখতে গেলাম ব্যাপারখানা। আমি যেই মাসু দিদিদের হেঁশেল ঘরের কাছে গিয়েছি অমনি দরজাটা নড়ে উঠলো আর ভিতর থেকে মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ এর মতো চাপা আওয়াজ আসলো। ভয়ে আমার হাড় হিম হয়ে গেল।
ঘরের ভিতর কি ওটা!

ভূত, নাকি চোর, নাকি অন্য কিছু।
মেজোদিদি বলে উঠলো ঘরের ভেতর চোর থাকতে পারে । কারণ হেঁশেল ঘরের পিছনের জানালাটা ভাঙা ওই দিক দিয়েই মনে হয় চোর ঢুকেছে। ওদিকে গোয়াল ঘরে বাঁধা গোরু ছটফট করছে। গোরুটাও বোধহয় ভয় পেয়েছে।

এদিকে আমি তো চোরের কথা শুনে আমার ভাঙা সাইকেলটা নিয়ে ঝনঝন করে আওয়াজ করতে করতে সিঁড়ির তলায় চলে গেলাম। আমার একমাত্র সাইকেল যদি চোর এসে নিয়ে চলে যায় তাহলে আমি পড়তে যাব কি করে । আবার মনে হচ্ছে চোর যদিও থাকে তাহলে সে দরজা নাড়াবে কেন! সে তো চুরি ক'রে নিয়ে পালাবে। এরকম সাত - পাঁচ বিভিন্ন চিন্তা মাথায় আসছিলো। যাই হোক আমি সাইকেলটা রেখে চলে এলাম । এদিকে আমার বড় দিদির ভূতের ভয় খুব। ও বলে উঠলো ঘরের ভিতর ভূত নেই তো! ঘরের ভিতরে ভূত কিন্তু থাকতেও পারে। আমরা সবাই ভয় এ চিৎকার করে উঠলাম। আমাদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সেজকাকি মেজকাকি আরো অন্যান্য অনেকেই চলে এসেছে আমাদের কাছে। সবার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে। এতক্ষণে মা আর কাকিমা বাড়ি চলে এসেছে। আমরা কি করবো ভেবেই ঠাওর করতে পারছিলাম না।

কিন্তু ঘরের ভিতর কি আছে সেটা তো দেখতে হবে। ভয় মিশ্রিত দেখার উৎসাহ নিয়ে মেজোকাকিমা বলে উঠলো দরজা খুললেই তো বোঝা যাবে দরজার ভেতর কি আছে । কিন্তু দরজা খুলবে কে। মা ভয় ভয় গলায় বলল আমি দরজা খুলতে পারবো না। যদি ভুতটা বেরিয়েই আমাকে ধরে! অন্যরাও দরজা খুলতে এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সবার এক ভয় দরজার ওপাশে যে আছে সে যদি দরজা থেকে বেরিয়ে এসে ধরে তাহলে কি হবে। শেষে সেজকাকিমা বলল আমি দরজা খুলছি কিন্তু তোরা সবাই প্রস্তুত থাকবি। ঘরে যে আছে সে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে তোরা মারতে আরম্ভ করবি।

সেজ কাকী মার কথা মত কেউ ঝাঁটা কেউ খুন্তি কেউ লাঠি আরও বিভিন্ন রকম জিনিস নিয়ে দরজার দুপাশে দাড়িয়ে পড়লাম। এ যেন মহাযুদ্ধে নেমেছি আমরা। তখনো সবার মনে ভয় কাঠের তুষের আগুনের মতো ধিক ধিক করছে। কাকিমা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতির মতো ভাবভঙ্গি নিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুললো। আমরা তো সবাই থ! কোথায় ভূত! কোথায় চোর! ঘরের মধ্য থেকে আমাদের পোষা ভোলু কুকুর গুড়গুড় চাপা আওয়াজ করতে করতে লেজ নাড়াতে নাড়াতে আমাদের সবাইকে অবজ্ঞা করে চলে গেল।

এদিকে বিড়াল টাও ব্যাঙ্গ হাসি হেসে ম্যাও ম্যাও করে পাঁচিল টপকিয়ে চলে গেলো। তখন আকাশে দু-একটা তারা দেখা দিয়েছে সেগুলোও যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

স্বপ্ন-শব

মুক্তি খাতুন
শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঘড়িতে যখন সকাল দশটা। কলকাতার রাজপথে কোলাহল নতুন কিছু নয়, তবে এতদিনের লকডাউনের পর কলকাতা যেন নতুন উদ্যমে সমস্ত টা শুরু করেছে । অফিস টাইমে কলকাতার রাস্তায় পা রাখা দায়, চারিদিকের বাস ট্রামের ছুটোছুটি আর জনগণের কোলাহল অনেক দিন পর কলকাতাকে পুরোনো ছন্দে সাজিয়ে তুলেছে । গলির মোড় থেকে বড় রাস্তা সব জায়গাতেই যানজট। হঠাৎ জোরে হর্ন বাজিয়ে একটি অটো বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল । অটোচালক গাড়ি থেকে হালকা মুখ বের করে সজোরে বলে উঠল ও দাদা , দেখে রাস্তা চলুন, মরার ইচ্ছে হলে অন্য কোথাও যান খামোখা আমার গাড়ির সামনে কেন, বেশ রাগান্বিত ভাবে গর্জিয়ে উঠলেন ।

২৬ বছরের একটি ছেলে মাটি থেকে উঠে বলল - "ক্ষমা করবেন দাদা, আমি খেয়াল করিনি" অটোচালক একটু রেগে বললেন তা খেয়াল করবেন কেন, এক্ষুনি কিছু হয়ে গেলে আমার রক্ষে থাকত না ।এই বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। ছেলেটি তার পড়ে থাকা বই ,দরকারি কাগজপত্র ব্যাগে তুলে নিল এবং ধুলো মাখা পেনটি মুছে বুক পকেটে ফুলের মতো সাজিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগল ।

ছেলেটির নাম রৌনক, বেশ কয়েক বছর হলো বি.টেক শেষ করেছে। চোখে তার অনেক স্বপ্ন, বড় ইন্জিনিয়ার হওয়ার, টেকনোলজি ব্যাপারটা আরও রপ্ত করার জন্য বিভিন্ন কোর্স ও করেছে। বাবা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, ছোট বোনের ইচ্ছে ভূগোলে অনার্স করার। বাবা অবসর নেওয়ার পর পেনশনের টাকায় সংসার চলে তাই সংসারের পুরো দায়িত্ব এখন রৌনকের কাঁধে। এই ছেলেটিকে যতই দেখি অবাক হয়ে যাই, কি অসাধারণ আচরণ, ফ্যাকাশে চিন্তিত মুখটাই জ্ঞানদীপ্ত দুটি চোখ অগ্নিগোলকের মত উজ্জ্বল,হালকা পাতলা গড়নের চেহারা । আজও ব্যাগভর্তি সার্টিফিকেটের বোঝা নিয়ে বেরিয়েছে চাকরি খুঁজতে । টেকনোলজি গ্রাজুয়েশনে ভালো নম্বর পেয়েও একটা চাকরি মেলেনি এতে সার্টিফিকেট গুলো তার কাছে নিতান্তই বোঝা বটে যা সে দীর্ঘ সময় ধরে বয়ে বেড়াচ্ছে। আজও হয়তো ফিরে আসতে হবে সাজসজ্জার অজুহাতে বা বসের চেনা লোকেদের ভিড়ের সমাগমে । এর আগেও বেশ কিছু কোম্পানির ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছে।

রৌনক অবশেষে পৌঁছালো ঝাঁ চকচকে অফিসরুমে । অফিসের ওয়েটিং রুমে ঢুকেই রৌনক নার্ভাস হয়ে পড়ল চাকরিটা হবে তো, বোনের পড়াশোনা, সংসার চালানোর খরচ ইত্যাদি নানান আকাশ পাতাল ভাবনায় মশগুল হয়ে পড়ল । হঠাৎ তাঁর ভাবনার অবশন ঘটল রিসেপশনে থাকা ম্যাডামের আওয়াজে মি.রৌনক দত্ত "স্যার আপনাকে ডেকেছেন" রৌনকের ইন্টারভিউ যখন শেষ হয় ঘড়ির

কাঁটা তখন ছু'য়েয় ঘরে তাড়াতাড়ি ক'রে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল কেননা তার টিউশনির ছেলেটা তার জন্য অপেক্ষা করছে । তবে ইদানীং পড়ানোতে রৌনকের তেমন মন নেই, হঠাৎ করেই যেন নিজেকে গভীর ভাবনায় হারিয়ে ফেলে, আবার বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছে করে না । মায়ের ফ্যাকাশে মুখ, দারিদ্র্য- ক্লান্ত বাবার চেহারা, আদরের বোনটার ছোটো ছোটো ইচ্ছে গুলো পূরণ না করতে পারাটা কেমন ওকে তীরের মতো বিধঁতে থাকে।

অন্যান্য দিনের মতো আজও সে টিউশনি শেষ করে গঙ্গার তীরে গিয়ে বসেছে । গঙ্গার অথৈ জল আর চরের ওপর সজোরে ছুটে আসা জলের নিরন্তর ঢেউয়ের মাঝে সে যেন নিজের জীবনকে উপলব্ধি করতে পারে । হঠাৎ তার চোখে ভেসে ওঠে পুরোনো কিছু স্মৃতি, এক সুন্দর যন্ত্রণাময় মানুষ সুদীপ্তাকে যাকে রৌনক অসম্ভব ভালোবাসতো, তাদের সম্পর্কের শুরুটাও এখানে আর শেষ ও। সুদীপ্তা রৌনকের কাছে আইডেন্টিটি চেয়েছিল সেখানে কমিটমেন্টগুলো কোনো জায়গা রাখেনি সময়ের সাথে নিঃশেষ হয়েছে। এইসব ভাবতে ভাবতে ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কর্মসংস্থানের কাগজ বের করে চাকরির খবরগুলো মার্ক করতে লাগল আর সযত্নে রাখা সার্টিফিকেট গুলো হাতে নিয়ে আলতো হেসে বলে উঠল আমার ২৬ বছরের অ্যাচিভমেন্ট, কতটুকু সফলতা দিয়েছো আমাকে, নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দেয় ,আর নীরবে চোখের কোনে জল গড়িয়ে পড়ে ।

তখনই ফোনটা বেজে ওঠে ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসে দাদা আমার কলেজের অ্যাডমিশন ফি টা লাগত।

একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের বড় বড় স্বপ্ন দেখা নিতান্তই বোকামি।তবুও আমরা রোজ প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখতে থাকি । বাস্তবতা আমাদের গলাটিপে হত্যা করলেও স্বপ্ন আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, আশায় আশায় বাঁচিয়ে তোলে । আমরা জানিনা আগামীকাল আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। তবুও আমরা কালের জন্য বাঁচি, নিজের জন্য নয়তো পরিবারের জন্য ।

আমি ধর্ষিতা

গৌরী বিশ্বাস
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

সত্যিই কি এই ভাবে সম্ভব?
না! কখনোই না! এভাবে আলোর দিশায় ফেরা সম্ভব নয়। শুধু আইন করে, মিছিল করে, মোমবাতি জ্বালিয়ে অন্ধকার ঢেকে দিচ্ছে সব কিছু, কিন্তু মনের অন্ধকার মুছে ফেলতে শুধু মোমবাতি যথেষ্ট নয়।

আমি গোটা নারী জাতি। আমার জীবন যাত্রায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলা কিছু ঘটনা থেকেই পরিচিত হয়েছি নিজের সাথে।

কোন একদিন দুপুর বেলা গাছের পাকা পেয়ারা দেখে খুব খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, তখন মাকে ডেকে বলেছিলাম-
ওমা দেখো গাছে পেয়ারা পেকেছে।
মা- খবরদার! গাছে উঠবি না বলে দিলাম।
আমি- কেন? উঠলে কি হবে?
মা- গাছ মরে যাবে।
আমি- উঠে দেখি তো গাছ মরে কিনা!
মা- দুষ্টুমি করিস না, খেতে ইচ্ছে হয়েছে ভাইকে বলে পেড়ে দেবে।
আমি- ভাই উঠলে দোষ হবে না? আমি উঠলেই দোষ?
মা- ওরে! তুই উঠলে পাড়ার লোকে তোকে গেছো ভূত বলবে, এতে কি তোর সম্মানটা থাকবে? সম্মান যদি কচুপাতা হয়, মেয়ে তার ওপর একফোঁটা জল। সম্মান নড়লে চড়লে মেয়ে ধপ্পাস।
আমি- আমি উদ্ভিদবিজ্ঞান ঘেঁটে দেখেছি নারীর স্পর্শে বৃক্ষ মরে যায় এমন তো কোথাও লেখা নেই।
মা- তোর পড়া আমি ছাড়িয়ে দেব। এত পড়াশোনা করে কি হবে?
আমি- আমার সাথে ভাইকেও স্কুল ছাড়িয়ে দেবে?
মা- ভাইকে কেন ছাড়িয়ে দেব? ভাই তো ছেলে।
আমি- ছেলে দামি! আর মেয়ে ফেলনা?
মা- বেশি কথা বলিস না তো। কম খাবি, কম কথা বলবি।
আমি- আমিতো কমই খাই। তুমি তো আমাকে কমই দাও। ভাইকে বেশি দাও। আচ্ছা মা, রান্না করো তুমি, কিন্তু মাছের বড় পিসটা বাবাকে কেন দাও? তুমি কেন খাও না? এসব কথা তোমার মনে হয় না কখনো?
মা- ওরে! আমি যে মেয়ে নই, আমি '**মেয়েছেলে**'। মেয়ে শব্দের সঙ্গে ছেলে শব্দ জুড়ে দেওয়ার মানে জানিস? ছেলের পিঠে ভর ছাড়া মেয়ে বাঁচে না। ঠিক যেমন দুর্বল চারা গাছকে সোজা রাখতে কঞ্চির দরকার হয়।

সেই সময় মায়ের সমস্ত কথার তাৎপর্য বুঝে উঠতে না পারলেও মেয়ে মানুষ যে পুরুষ মানুষের থেকে আলাদা সেটা খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম। আবার কোনো একসময় কিছু খেলার সাথীদের সাথে আড্ডা দিতে গিয়ে হঠাৎ-ই আমি বলে উঠেছিলাম- জানো, আমি খুব সাজি। প্রশ্ন এসেছিল- নিজের জন্য সাজো নাকি অন্যকে দেখানোর জন্য? উত্তরে বলেছিলাম- দুটোই, আমি যে মেয়ে। এই বলাতেই একজন প্রশ্ন করেছিল- মেয়ে মানে কি জানো? খুব সহজেই উত্তর করেছিলাম- 'মেয়ে মানে মা'। তখনই সবাই কেমন যেন হাসবাক্যে বলেছিল- 'মেয়ে মানে মাল'!
এসব বাজে কথা, এই বলে সেইদিন সবটা এড়িয়ে গেলেও, এড়িয়ে যেতে পারিনি সমাজের নানান কটূক্তি থেকে, যেগুলি আমাকে আমার জীবনের তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করেছিল। যেমন -

পণ্য-সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে তোমার ছবি। তুমি বিক্রি হও। হাটে-বাজারে, অলিতে-গলিতে, বিয়ের আসরে তোমাকে বেচে দেওয়া হয়। পণ দিতে হয়, পণ দিতে না পারলে তোমাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়।
-কেমন যেন আঁতকে উঠে এক-তৃতীয়াংশ অশ্রু চোখে মনে মনে বলে উঠেছিলাম- আমাকে মেরো না, আমি বাঁচতে চাই। আমি মুক্তি চাই। মুক্ত মানুষ চাই। মুক্ত পৃথিবী চাই।
মেয়ে মানে মেনে চলা, মেয়ে মানে মানিয়ে চলা।
মেয়ে মানে জোরে কথা বলবে না, জোরে হাসবে না, কম খাবে, সবাই যা বলে শুনবে।
খুব ভাল করে মনে রেখো তুমি যখন ঘরের চৌকাঠ ডিঙোবে তখন লোকে তোমাকে আড় চোখে দেখবে, গাল দেবে, পিছু নেবে। কারণ বাজারে এত সস্তায় আর কিছু মেলে না যত সস্তায় মেলে মেয়ে মানুষ।
বৈদিক সভ্যতা থেকে আধুনিক সভ্যতা পৃথিবীতে এমন কোন শাস্ত্র নেই, এমন কোনো ধর্ম নেই, যেখানে নারীকে মানুষ বলে গণ্য করা হয়েছে।

বৈদিক সভ্যতার শাস্ত্রকার মনু ঋষিমুনির শাস্ত্র থেকেই সম্ভাব্য নারীর প্রতিনিয়ত জীবনের এক সুসংবদ্ধ তালিকা তৈরি হয়েছিল, যার পরিধি আমাদের আধুনিক সমাজেও বিশালাকারে বিস্তৃত। মনুশাস্ত্র থেকেই মেনে চলা হত- **নারী নরকের দ্বার** ।
নারী অশুভ, গরু-ঘোড়ার সাথে নারীকে দান করতে হয়।
কোনো পাখি, শকুন, ছুঁচো ও কুকুর হত্যায় যে প্রায়শ্চিত্ত, নারী ও শূদ্র হত্যায় সেই একই, মাত্র একদিনের কৃচ্ছসাধন। প্রচলিত ছিল- ভাগ্যবানের বউ মরে আর অভাগার মরে গরু। কারণ গরু কিনতে টাকা লাগে আর বউ আনলে টাকা পাওয়া যায়। নারীর স্থান গরুরও নীচে।
নিজের দেহ ও সম্পত্তি কোনটার ওপরেই নারীর কোন অধিকার ছিলনা। কেবল পতিসেবা করাই ছিল নারীর বেদাধ্যায়ন।
নারীর জন্য ছিল শিক্ষা নিষিদ্ধ, ব্রহ্মচর্য নিষিদ্ধ, ধনার্জন নিষিদ্ধ, স্বাধীনতা নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র জাহান্নামে পাঠাবার দরজাটাই হয়তো খোলা ছিল।

আজ এই সভ্যতাকে অতিক্রম করে এলেও পুরুষতান্ত্রিক সামাজিকতার ছাপ এখনো সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। মোছা যায়নি মনের অন্ধকারকে। কারণ আজও প্রশ্ন ওঠে বেশি রাতে মেয়েরা কেন একা রাস্তায়? প্রশ্ন ওঠে মেয়েদের পোশাক কেন এত খোলামেলা?

আজও আমাকে স্বপ্ন দেখতে নেই,
আমাকে গল্প লিখতে নেই,
আমাকে ছন্দ বুঝতে নেই,
আমাকে মন্দ দেখাতে নেই।

আমি সেই মেয়ে যাকে রোজ আপনি চলার পথে, ট্রেনে, বাসে, রাস্তায় দেখেন।
আমি সেই মেয়ে যার পোশাক, পরনের গহনা, পায়ের গোড়ালি আপনি রোজ দেখেন।
আবার আমি-ই সেই মেয়ে যাকে সন্ধ্যার পর রাস্তায় একা পেলে আপনার ভেতরের হিংস্র, ক্ষুধার্ত জন্তুটা উল্লাসে ফেঁটে পড়ে। আর খুঁজতে থাকে অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। পণ্যের বিনিময় হোর্ডিং জুড়ে সাপটে দেওয়া হয় আমার খোলা পিঠ। আবার, শরীর আগলে লুকিয়ে বাঁচতে শিখেও যদি কখনো অসাবধানতার বশে ভুলচুক হয়, তখনও সেই দুই বছরের আমি-কে ধর্ষিত হতে হয় কেবল আমার-ই দোষে।
উন্নয়ন, বিশ্বায়ন, প্রগতি, গণতন্ত্র কতসব গালভরা কথা- 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' গালভরা প্রতিশ্রুতির মাঝেও রক্তাক্ত আমি পড়ে থাকি অবজ্ঞায় অবহেলায়।

আমি লক্ষ্মী নই, আমি ভগবতীও নই, আমি দলিত কন্যা যাকে খুব সহজেই আকর্ষণীয় সামগ্রীর লোভ দেখিয়ে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। যাকে ধর্ষণ করে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, আবার কখনো যার জীবন্ত দেহকে পুড়িয়ে মারা হয়। উত্তরপ্রদেশে ঘটে যাওয়া এমনই এক দলিত ধর্ষিত কন্যাকে (আমাকে) চিতার আগুনে পোড়ানো হয়েছিল প্রশাসনের সম্মুখে, যেখানে প্রশাসন কেবলই নীরব থেকে হাততালি দিয়েছিল। গোটা দেশ এই হাথরাস কাণ্ডের আওয়াজ তুললেও প্রতিনিয়ত আনাচে-কানাচে ঘটে চলা কতশত হাথরাস কাণ্ডের কোনো হিসেব রাখেনা এই সমাজ, এই প্রশাসন।
বাজরার ক্ষেতে রক্তের দাগ একদিন মিলিয়ে যাবে। ডিজেল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া চিতাভস্ম মাটিতে মিশে যাবে ঠিকই, কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ঠাকুরদের দলিত নির্যাতন থামবে না। অবশেষে আমাদেরই শুধু মোমবাতি হাতে ধ্বজা ভাঙ্গা রথের ন্যায় এগিয়ে চলতে হয়।

আজ আমি ধর্ষিতা,
বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন রূপে ধর্ষিত হই।
চলার পথে কুৎসিত বাক্যেতে আমি ধর্ষিত,
ধারালো দৃষ্টিতেও আমি ধর্ষিত।
এবার সময় এসেছে চিৎকার করার-

সমস্ত মিথ্যার জাল ছিঁড়ে মানুষ হয়ে ওঠার।
তাইতো আজ আর্জি জানাই,
নারী নয় আর, এবার হোক মনুষত্বের পরিচয়।
নারী বলে পরিচিতি নয়, মানুষ বলে চিনুক সবাই
তবেই বোধহয় 'ধর্ষিতা' আর
হবে না নারীর পরিচয়।
মানুষ হয়ে নারী এবার ভয়কে করুক জয়,
নারী নয়, মানুষ বলেই দিও পরিচয়।

নারী_নয়_মানুষ_হোক_আসল_পরিচয়

এক রাতের অভিজ্ঞতা

মুক্তি খাতুন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

প্রতিবছর গরমের ছুটিতে আমার একান্ত প্রিয় জায়গা আমাদের দেশের বাড়ি পলাশডাঙ্গা। তাই সারাবছর স্কুলের স্যার, ম্যাম ও মায়ের নরম বকুনি আর পড়াশোনার ভালোবাসার জাল ছিন্ন করার জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করতে থাকি গরমের ছুটির ।

এবছর সেখানে যাওয়ার তোড়জোড়টা একটু আগে থেকেই সেরে নিয়েছিলাম। এই নির্জনতার মাঝে কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠেছি।

সবটাই ঠিকঠাক যাচ্ছিল কিন্তু ওই যে কাল রাতে টিউশন স্যারের ফোনকল এসেছে মায়ের কাছে। তারপর সবটা যেন মেঘহীন আকাশে বজ্রপাত হবে বলে মনে হচ্ছে। তাও একটু সাহস করে বলেই ফেললাম।

- আচ্ছা মা আমরা কাল কখন বেরোচ্ছি।
- কোথায় বল তো
- কেন, আমাদের দেশের বাড়ি। পলাশডাঙ্গা।
- কোথাও যাচ্ছি না আমরা,কাল থেকে নিয়ম করে পড়াশোনা শুরু করবে।

ভালো ভাবেই বুঝতে পারলাম কাল রাতে মায়ের মগজ ধোলাইটা ভালো ভাবেই হয়েছে। অগত্যা মাকে আর কিছু বলার সাহস হলো না। শেষ আশ্রয় একমাত্র বাবা।
- ও বাবা।

আমার শুকনো মুখ দেখে বাবা বলে ওঠে...
- আচ্ছা ছাড়ো না ।অনেকদিন তো কোথাও যাওয়া হয় না।একটু বেড়িয়েই আসুক । ঘুরে এসে আবার পড়াশোনায় মন দেবে এটা যেন মনে থাকে।
- হ্যাঁ, আমার মনে থাকবে।তাহলে যাচ্ছি তো আমরা।
পরের দিন সকালের খাবার খেয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। জলাপুকুর, নানান ধরনের গাছ, গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ছোট্ট রাস্তাটির দুপাশে সবুজের আনাগোনা দেখে মন জুড়িয়ে যায়। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আমাদের গাড়িটি থেমে গেল। হঠাৎ মা বলে উঠলো -
- কি হলো গাড়ি থামালে কেন?
- কি হলো বুঝতে পারছি না। দাঁড়াও দেখছি ।
এই বলে বাবা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সূর্য তখন মাথার ওপর। বুঝলাম বেলা তখন দ্বিপ্রহর । এইসব ভাবতে ভাবতেই বাবা আমাকে ডেকে বলল
- জানিস অনি।আমার বাবা বলতো এই তালতলার মোড়ে নাকি আগে শশ্মানঘাট ছিল।অনেক গেছো মেছোর দল ও নাকি দেখা যেত এখানে।
এইসব কথা শুনেই মা খানিকটা কর্কশ গলায় বলে উঠল
- ছাড়ো তো যতসব আজগুবি কথা।একটু তাড়াতাড়ি দেখো না কি হয়েছে ।খুব গরম পড়েছে।
গাড়িটি একটু ঠেলতেই চলতে শুরু করল। অতঃপর আমরা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম ।দেখলাম পরেশদাদু আমাদের জন্য সদর দরজায় অপেক্ষা করছে। বাড়িতে ঢুকে নিজেদের কাজকর্ম সেরে নিলাম। বিকেলবেলায় সারাবাড়িটা একবার ঘুরে দেখলাম।

আগেই বাবার কাছে শুনেছিলাম পরেশদাদু বাবাকে নাকি অনেক গল্প শোনাতেন। সেগুলি বেশিরভাগ টাই নাকি সত্যি আর পরেশদাদুর যৌবনের অভিজ্ঞতা। তাই সেদিন ঠিক হলো আজ আমরা পরেশদাদুর কাছে গল্প শুনবো। সন্ধ্যে গড়াতেই আমরা ছাদের একপ্রান্তে মাদুর পেতে নিজেদের মতো জায়গা দখল করেছি। মাঝখানে ছোট্ট একটি লণ্ঠন জ্বলছে।বাইরের অন্ধকারটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।মাঝে মাঝে কয়েকটি জোনাকি এসে হাতে মুখে বসছে আবার উড়ে যাচ্ছে। দূরের ফাঁকা মাঠটায় বেশ কিছু কুকুর ডাকছে। এরমধ্যেই পরেশদাদু বলে ওঠে...
- আচ্ছা শোনো তাহলে, এটি একটি সত্যি ঘটনাই বটে। তবে এখন কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তখনকার দিনে আমাদের গাঁ থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ধানের আড়ত থেকে ধান আসত । কখনো কখনো নিতেও যেতে হত।সেইবার নিতে যেতে হবে। যাতায়াত ব্যাবস্থা বলতে গোরুর গাড়ি। সেদিন সন্ধে নাগাদ রাতের জন্য কিছু শুকনো খাবার নিয়ে রওনা দিলাম। গ্রামের এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে টিমটিমিয়ে চলছে গাড়ি । তবে গ্রামের তখনকার রাস্তাগুলির সাথে এখনকার রাস্তার আকাশ পাতাল তফাৎ। রাস্তার মাঝে ছোট বড়ো গর্তে ভরা ।তাতে আবার বৃষ্টি দেবতার কৃপায় কালরাতের বৃষ্টিতে জল জমে ভরাট হয়ে গেছে।সাথে থাকা কেরোসিনের বাতিটাও নিভ নিভ ভাব। কাজেই রাস্তার ছবিটি অস্পষ্টই বটে । গাড়িটি কখনো গর্তে হুড়মুড়িয়ে পড়ছে আবার কখনো থেমে যাচ্ছে।এইভাবে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট ও হয়েছে রাস্তায় । তবে এইভাবে চলতে থাকলে আজ আর ধানের আড়ত পৌঁছানো হবে না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে তালতলার মোড়টাই বেছে নিলাম।

রাস্তাটি সদ্য ইট দিয়ে তৈরি হয়েছে, তাই গর্তের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে। তবে ওই রাস্তার পাশে একটি শশ্মানঘাট পড়ে। যাক্ গে এতোকিছু ভেবে সময় নষ্ট না করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম। রাত যতই বাড়তে থাকে অন্ধকার ততই গাঢ় হতে থাকে।অন্ধকারের গাঢ়ত্ব দেখে বুঝলাম রাত তখন প্রায়

বারোটা। পথ একেবারেই নির্ঝুম,জনহীন, প্রানহীন, একটা শেয়াল ,কুকুর ও চোখে পড়ছে না। কিছুটা পথ যাওয়ার পর বেশ কয়েকটা গলার আওয়াজ কানে এলো ... বলো হরি হরিবোল, বলো হরি হরিবোল

মুহূর্তে আঁৎকে উঠে দেখলাম কয়েকজন লোক মিলে খাটিয়া করে একটা শবদেহ নিয়ে যাচ্ছে। কেন জানিনা মনে হলো শবদেহটি আমাকে দেখে মুচকি হাসছে।ওই দিকে চোখ স্থির থাকায় গাড়ি কোন দিকে যাচ্ছে খেয়ালই রাখতে পারিনি। হঠাৎ কানের কাছে একটা ভারী ঠাণ্ডা আওয়াজ ভেসে এলো-
শশ্মানঘাটে যাওয়ার শখ হয়েছে ...দেখে চালা

মুহূর্তের মধ্যে আমার হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। ভয়ে আতঙ্কে কিছু বুঝে না উঠতেই সামনে থেকে একটা ধবধবে সাদা ঘোড়া দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে আমার দিকে। এক ধাক্কায় আমি গাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পড়লাম।নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মাটিতে উঠে দাঁড়াতেই দেখি চারিদিকে আগুন জ্বলছে।আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। চিৎকার করতে গিয়ে মুখে এক গভীর আড়ষ্টতা অনুভব করলাম। মনে মনে বললাম তাহলে কি অবশেষে শশ্মানে এসে পড়লাম।

ভবিতব্য কখনো কখনো মনের ভাবনাকেও সত্যি করে দেয় । তার চিহ্ন পেলাম চারপাশের জ্বলন্ত চিতাগুলো দেখে।অস্থির আতঙ্কিত মনে একটু জোর তৈরি করার চেষ্টা করলাম।তবে কতটুকু পারলাম জানিনা। চারিপাশটা একবার দেখে যখনই রাস্তার দিকে পা বাড়াতে যাব ওমনি একটা ঠান্ডা বরফ স্পর্শ অনুভব করলাম আর কানের কাছে সেই শীতল আওয়াজ আবারও ভেসে এলো
কোথায় যাচ্ছিস, আয় না একটু খেলা করি,কত্তদিন খেলি না, চল না একটু খেলি।

আমি কৌতূহলবশত পেছনের দিকে তাকাতেই দেখি বেশ কয়েকটি চিতার মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। নিষ্ঠুর কাঠের জ্বলন্ত আগুনে শবদেহগুলির রক্তমাংস ঝলসে গলে গলে পড়ছে।রক্তাক্ত ঝলসানো চোয়ালের দাঁতের ফোকর দিয়ে তারা এক বিকট হাসি হাসছে। শবদেহ গুলি এক বীভৎস ভয়ংকর খেলায় মেতেছে। আমি কখন যে এই ভয়াবহ দৃশ্যের দর্শক হয়ে উঠেছি বুঝতে পারিনি। আমার চোখ দুটি এই বুঝি কোঠর থেকে বেরিয়ে আসবে।আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না।এই বোধহয় আমার প্রান পাখিটা খাঁচা ছেড়ে পালাবে।আমি ধীরে ধীরে শীতল হয়ে পড়ছি।চোখ দুটি কেমন যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

পরেশদাদু এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে
আবার বলতে শুরু করল -
তারপর জানিনা কি কীভাবে ঐ অবস্থা থেকে বেঁচে ফিরলাম ।তবে পরে শুনেছিলাম পাশের পাড়ার সমর কাকা আমাকে বাড়ি দিয়ে গেছিল। তারপর থেকে রাতে একা একা ও পথ আমি আজও মাড়াইনি।

হুল বিদ্রোহ

মৃন্ময়ী সরেন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

হুল শব্দের অর্থ হল "বিদ্রোহ"। এই বিদ্রোহ বা আন্দোলন হয়েছিল শুধুমাত্র বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য।
জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুর জেলার ভাগনাডিহি নামক গ্রামে সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়।যা হুল বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
ইংরেজ আমলে স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়ে সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে।এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র গণসংগ্রাম। এই সংগ্রামের প্রধান নেতা ছিলেন সিধু এবং কানু মুরমু এছাড়াও চাঁদ ও ভৈরব মুরমু।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অত্যাচার বেড়ে যাওয়ায় সিপাহী বিদ্রোহের আগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৫ সালে সাঁওতালরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল অধিকার আদায়ের জন্য। আন্দোলনে আদিবাসী সাঁওতাল নারীদের অংশগ্রহণ ছিলো অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অধিকার আদায়ের আন্দোলনে আদিবাসী নারীরা ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকেনি, তারাও হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফুলমণি মুরমু এবং ঝরনা মুরমু।

তারা সবাই মিলে এই আন্দোলন বা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ইংরেজদের শাসন-শোষণ, সুদখোর মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সৈন্য ও তাদের দোসর অসৎ ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর ও মহাজনদের অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাঁওতাল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

এই যুদ্ধ ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন শুরু হয় এবং ১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাসে তা শেষ হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। শুধুমাত্র নিজেদের অধিকার রক্ষা করে বেঁচে থাকার জন্য।

সিধু মুরমু ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং পরে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
কানু মুরমু ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক। প্রধানতম নায়ক সিধু মুরমু র অগ্রজ। ১৮৫৬ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ভগ্নাডিহির নিকট পাঁচকাঠিয়া বট বৃক্ষে বেলা পৌনে ২ নাগাদ ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয়।ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন-"আমি আবার আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলব।"৪৫মিনিট তাঁর দেহটি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রাখার পর,সেটিকে নামিয়ে এনে পুড়িয়ে ফেলে দেয়।বর্বর ইংরেজ সরকার কানুর মৃতদেহটি তাঁর আত্মীয় স্বজনদের হাতে তুলে দেবার সৌজন্য বোধ করেনি।
চাঁদ মরমু ও ভৈরব মুরমু তাঁদের(সিধু মুরমু এবং কানু মুরমু) অনুজ। এরা এই ভয়ংকর যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন।

ফুলমুনি মুরমু হল সিধু-কানুর বোন । ফুলমনির লাশ উদ্ধার করা হয় রেললাইনের ধার থেকে। ব্রিটিশ সেপাইরা শারীরিক অত্যাচারের পর তাকে হত্যা করে সেখানে ফেলে যায়।

ঝরনা মুরমু হল সিধু মুরমু এবং কানু মুরমু ছোট বোন। এই যুদ্ধে তিনি ও প্রাণ হারান।

নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে এইভাবে সকলেই প্রাণ হারিয়েছে।

স্বপ্নপূরণ

মেহেনাজ পারভীন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

রাধানগর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ইরা|ইরা ছিলো খুবই লাজুক স্বভাবের, ইরার স্বপ্ন ছিলো বিচিত্র ধরনের, তার মন স্থায়ী ছিলো না, কখনো সে ভাবতো পড়াশোনা করে চাকরি করবে, কখনো ভাবতো লেডিস পার্লার করবে, কখনো তার ভাবনার মধ্যে ছিলো সে অনেক বড় ইউটিউবার হবে, আবার কখনও ভাবতো নিজস্ব কোনো কোম্পানির প্রোডাক্ট তৈরি করে বাজারে ছাড়বে, কিন্তু ওই যে প্রতিবেশীদের মতে মেয়ে মানুষের আবার স্বপ্ন? তাই ইরা বাস্তবের চেয়ে কাল্পনিক ভাবনায় বেশি ভাবতো | তবে তার প্রখর ইচ্ছা ছিলো কিছু একটা করবে অনেক টাকা উপার্জন করে দেশ বিদেশ ঘুরবে, নাম ,যশ, খ্যাতি অর্জন করবে এটা তার একমাত্র লক্ষ্য ছিলো ইরা অস্থির স্বভাবের ছিলো ,যখনই যে ভাবনা তার মধ্যে আসতো তা বাস্তবায়িত না হলে কেমন যেন পাগলের মতো আচরণ করতো|ইরা পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলো কিন্তু তার পড়াশোনার প্রতি ততটাও ঝোঁক ছিল না| প্রত্যেকটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো ইরার পরিবারের মানুষজনও চাইতো ইরা পড়াশোনা করুক চাকরি পেলে পাবে ,নইলে উপযুক্ত বয়স হলে বিয়ে দিয়ে দেবেন। ইরার মধ্যে অনেক সুপ্ত প্রতিভা ছিলো সেগুলি কাউকে বলেওনি, আর ইরা তার মনের ভেতরের কথা কাউকে বলতে চাইতো না তার কষ্টের কথা কাউকে জানাতো না, নিজের মধ্যেই চেপে রাখতো কারণ ইরা ছিল চাপা স্বভাবের। ইরা গান না শিখলেও তার গানের সুর ছিল অসাধারণ। সে যখন কবিতা বলতো যেন সত্যিই মনে হতো কোনো কবি আবৃত্তি করছে, সে রান্নাও খুব ভালো করতো নানান দেশি-বিদেশি ধরনের রান্না পারতো। এমনকি সে এত ভালো অভিনয় করতো যেন বাস্তবে সেটি হচ্ছে। একদিন সে একটি ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করে,কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু লাভ হয় না, ওই যে, তার মন ছিলো অস্থির প্রকৃতির সে যেটার প্রতি ধ্যান দিতো সেটা তখনই হওয়া চাই। কিন্তু দুদিনে ইউটিউব চ্যানেল খুলে তো আর বড়ো ইউটিউবার হওয়া যায়না, ইরা শুধুমাত্র কল্পনাতেই ভেবে গেল অনেক টাকা উপার্জন করবে নাম, যশ ,খ্যাতি, অর্জন করবে, ইরা ভাবে বাস্তবে হয়তো তার স্বপ্নগুলো পরিণতি পাবেনা। ইরা গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সে ভাবতে থাকে থাকে তাহলে কি তার স্বপ্নগুলো পূরণ হবার নয়? একদিন সে ঘরে চুপ করে বসে থাকে আর নানান ধরনের ভাবনা তার মনের মধ্যে আসতে থাকে ঠিক সেই সময় তার বাড়ির পাশ দিয়ে একজন মাছ বিক্রেতা মাছ বিক্রি করছে এবং উচ্চস্বরে বলতে থাকে ' মাছ নেবে গো' 'মাছ আছে'। তখন সেই আওয়াজ ইরার কানে আসে এবং ইরা ভাবতে থাকে যে ওই মাছ বিক্রেতা রোজ দেখি এত কষ্ট করে রোদ, ঝড়, বৃষ্টিতে মাছ বিক্রি করতে

আসে।ইরা সেই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে ওই মাছ বিক্রেতার কাছে যায় এবং জিজ্ঞাসা করে আপনাকে রোজ দেখি রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক, শত বাধাতেও রোজ মাছ বিক্রি করতে আসেন একদিন তো বিশ্রাম নিতে পারেন ? মাছ বিক্রেতা উত্তরে জানাই আমি যদি একদিন মাছ বিক্রি না করি তাহলে আমার সংসার চলবে না, খাবার জোগাবো কি করে? ইরা মাছ বিক্রেতার কথা শুনে মনে মনে ভাবে সত্যিই তো মাছ বিক্রেতা একদিন মাছ না বিক্রি করলে তার সংসার চলবেনা ,সংসারের টানা-পোঁড়োনে সে শত কষ্টের মাঝেও মাছ বিক্রি করতে আসছে, ইরা নিজের জন্য তখন ভাবে তার স্বপ্ন পূরণ না হলে সেও তো মন থেকে কখনোও আনন্দ করতে পারবে না। হয়তো এভাবেই গভীর চিন্তা করতে করতে শত কষ্টর মধ্যে তাকে জীবন কাটাতে হবে, স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার বেদনায়। ইরা আর কিছু না ভেবে তখনই ঘরে এসে একটি ইউটিউব চ্যানেল নতুন করে ক্রিয়েট করে এবং রোজ রান্নার ভিডিও করে তার চ্যানেলে ভিডিওগুলি এডিট করে ছাড়তে থাকে, কিন্তু দেখা যায় তার ভিডিওতে খুব একটা ভিউজ হয় না, সাবস্ক্রাইবার ও তেমন হয় না। কিন্তু ইরা আর হাল ছাড়ে না সে ধৈর্য রাখে ইরা এভাবেই অনেক পরিশ্রম করতে থাকে। হঠাৎ একদিন ইরার চ্যানেল অনেক ভিউজ আসে, সেদিন ইরা খুব খুশি হয় এবং সে অনেক উৎসাহী হয়ে আরো নানান রকমের খাবার তৈরির ভিডিও করে, ধীরে ধীরে দেখা যায় ইরার চ্যানেলে অনেক সাবস্ক্রাইবার হয়, অনেক ভিউজ হয়, অনেক অনেক লাইক পড়ে এবং একটা সময় ইরা অনেক বড় ইউটিউবার হয়ে যায়। তার পাশাপাশি ইরা আরো দু - তিনটে ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করে 'যার মধ্যে ছিল মিউজিক ভিডিও চ্যানেল। ইউটিউব থেকে ইনকাম করার টাকাতেই ইরা একটি ছোটখাটো হোটেল খোলে। আস্তে আস্তে ইরার হোটেলে প্রচুর লোকজন খেতে আসে, প্রচুর ভিড় হয়, ইরার রান্নার মধ্যে কেমন যেন একটা জাদু ছিলো, তার রান্নার স্বাদ ছিল অসাধারণ। এভাবেই চলতে থাকে এবং ইরা আসতে আসতে অনেক টাকা ইনকাম করে এবং সেই টাকাতে ইরা শহরে একটি বড় হোটেল কেনে এবং রান্নার জন্য অনেক লোকও রাখে হোটেলে। ইরার রান্না নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে অনেক দেশি- বিদেশি লোকজনকেও দেখা যায় ইরার হোটেলে এসে ভিড় করে, ইরার হোটেল রমরমিয়ে চলতে থাকে, তার হোটেলের রান্নার প্রশংসা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ইরার হোটেল থেকে অনেক দূর দূর জায়গায় হোম-ডেলিভারির ও ব্যবস্থা করা হয়,এবং অনেক টাকা ইনকাম করে, তার হোটেলের অনেক নামডাক হয়। ইরার স্বপ্ন গুলো আস্তে আস্তে পূরণ হতে থাকে সে অনেক নাম, যশ, খ্যাতি অর্জন করতে থাকে, ইরা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়। এখন ইরা খুব আনন্দের সঙ্গে, স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন কাটায়, কারণ সে তার স্বপ্ন গুলোকে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইরা এই জায়গায় এসে ভাবে সেদিন যদি ধৈর্য না রাখতো, কষ্ট না করতো তাহলে হয়তো সেএই জায়গায় আসতে পারতো না। কষ্ট করেছিল বলেই না ইরার জীবন আজ অত্যন্ত সুখের হয়েছে।

নীতিকথা: গল্পে শিক্ষণীয় বিষয় এটাই যে ধৈর্য্য রাখো,সৎ থাকো, মনকে স্থির করো, অস্থির হইও না, যে কাজের প্রতি তুমি আগ্রহী সেটিকেই তুমি তোমার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করো সাফল্য আসবেই (কষ্ট করলে কেষ্ট পাওয়া যায়)।

শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ

প্রিয়া সালুই
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

বাস্তবিকই রবীন্দ্র প্রতিভা এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। তিনি একই সঙ্গে কবি, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, চিত্রশিল্পী আরও অনেক কিছু। তাঁর সৃষ্টিশীলতার বহু বিচিত্র ধারা কেবল দেশবাসীর নয়, বিশ্ববাসীর মনকেও প্লাবিত করেছে। তাই জন্মের একশত ষাট বৎসর পরেও যে মানুষটি আমাদের এত প্রিয়, এত আপনজন তাঁর জন্মোৎসবের নিশ্চয় আলাদা মাত্রা ও ভিন্ন তাৎপর্য আছে। কেন তিনি আজও মানবমনে রবির মতোই উজ্জ্বল তা বুঝতে গেলে একশত ষাট বৎসরের প্রেক্ষিতে তাঁর আদর্শ, ভাবনা ও মানবতার মূল্যায়ন করতে হবে।

কবি নিজেই বলেছিলেন- "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।" এই কথার সূত্র ধরে আমরাও বলতে পারি রবীন্দ্রনাথকে জানা আমাদেরও ফুরাবে না। কারণ আজও তাঁর গদ্যে, গানে, কবিতায় আমরা নিজেদের যেমন খুঁজে পাই, তেমনি তাঁকেও চিনতে পারি নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা রূপে। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের -

হাতের লেখায়
কথা বলার ভাষায়
পরীক্ষার খাতায়
গভীর আনন্দ ও গহন ব্যথায়
মনের ছন্দে
ফুল ফোটার গন্ধে।

রবিঠাকুর আমাদের আশ্রয়, ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য সবকিছু। একশত ষাট বৎসর আগে নয়, প্রতিদিনই তাঁর জন্ম নতুনভাবে, নতুন ভাবনায়। তিনি মৃত্যুহীন প্রাণ। তাই কালের কালাপাহাড় এসে ভারতবর্ষ থেকে যদি সমস্ত ঠাকুরের পূজার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে যায়, তবুও চিরকাল প্রজ্বলিত থাকবে রবিঠাকুরের পূজার প্রদীপ।

আমরা তাঁর সৃষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আমরা খুঁজে নিই মনের কথা, প্রাণের কথা, মননের কথা। বলতে ইচ্ছা করে -

তোমার আপন হাতের দোলে
দোলাও দোলাও দোলাও
আমার হৃদয় ।

এত কিছুর পরেও কবির কলমে বেরিয়ে এসেছে হৃদয় নিংড়ানো আক্ষেপ-

"আমার কবিতা জানি
গেলেও বিচিত্র পথে
হয়নি তা সর্বত্রগামী"।

কবির গানের বানীতেও কবির ভূমিকা যেন সত্য হয়ে ওঠে আমাদের জীবনে। রবীন্দ্রসংগীত আমাদের প্রাণের অন্বেষণ। তাঁর গানের সুরে সহসা উদ্বেল হয়ে মন বলে ওঠে-

"তুমি কেমন করে গান করো
হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি"।

রবিকিরণ আমাদের মধ্যে এমনই বিচ্ছুরিত যে, যেখানেই চোখ মেলি সেখানেই রবীন্দ্রনাথ। তিনি যেন সর্বত্র বিরাজমান হয়েই বলেছেন-

"এই আকাশে আমার মুক্তি
আলোয় আলোয়"।

তাই মনে রাখতে হবে বাঙালি জীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি উৎসব। এই উৎসবে আমরা যদি ঠিকমতো সামিল হতে পারি তাহলেই রবীন্দ্র আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ক্ষণকালের ক্ষুদ্রতাকে সরিয়ে চিরকালের মানুষ হতে পারবো, তাহলেই আবার মানবিক মূল্যবোধহীন ক্ষতবিক্ষত বিশ্ব খুঁজে পাবে সঠিক পথের দিশা।

প্রথম দেখা

রুমা ঘোষ
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

তোমার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ওই যে তিন রাস্তার মোড়ের মাথায়, অবশ্য সেদিন ছিলো বৃষ্টি ভেজা দিন, আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ওপারে ছাতা হাতে। প্রথম দেখায় কাউকে এতটা ভালো লাগতে পারে সেদিন তোমায় না দেখলে কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হতো আমার কাছে। অবশ্য আমি জানতাম তুমি অন্য কারো প্রেমিক, যদিও সেটা শোনা কথা ছিলো, তাই ভালো লাগাটা নিজের মধ্যে'ই রেখেছিলাম কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম যখন জানতে পারলাম তুমিও আমার প্রেমে পড়েছো, সেখান থেকে শুরু হয় আমাদের পথ চলা।

ভাবতে খুব অবাক লাগত কীভাবে একটা মানুষ এতটা ভালোবাসতে পারে কাউকে? আমি ও ধীরে ধীরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম তোমার ওপর, আর হবই বা না কেন আমায় তো কখনো নিজের খেয়াল রাখতে হয়নি ওটা তুমি ই রাখতে, তুমি তো আমার না বলা কথা গুলো ও সব বুঝতে পারতে,তখন ভাবতাম তুমি হলে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার।

তুমি কখনো আমায় জিজ্ঞেস করলে তোমার জীবনের স্মরণীয় দিন কোনটি আমি বলতাম ওই যে তোমার সাথে দেখা হওয়া প্রথম দিন। প্রথম দেখাটা যেন মনে অন্য রকম জায়গা করেনিয়েছিল আমার.এই ভাবে ৬ মাস কেটে গেল এখন অনেক কিছুই বদলে গেছে তার দেখা চেনা মানুষটি ও ,সে এখন আর আমার খেয়াল রাখতে পারে না, আর খেয়াল রাখবেই বা কী করে সে তো এখন আমার কোনো কথায় বুঝতে পারে না,সে তো এখন অন্য কারো খেয়াল রাখতে ব্যস্ত ....

অনেক বুঝিয়েছি তাকে তার সান্নিধ্যে অন্য কারো আসাটা আমি সহ্য করতে পারছি না প্রিয়। অনেক চোখের জল ফেলেছি আর ভেবেছি মানুষ চিনতে এতটা ভুল হ'ল আমার? অবশেষে ভাবলাম এইভাবে অবহেলায় আর থাকা যায় না তাকে বলেছিলাম আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না প্রিয় তুমি ভালো থেকো। আজ দুবছর পর দুটি পথ আলাদা হয়ে গেল এবং দুজন দুদিকে চলল, মেয়েটি মানে রাত্রি সে অপেক্ষা করতে থাকে তার প্রিয়তম পাপাই- এর জন্য সেভাবে সে হয়তো ফিরে আসবে, মেয়েটি সেই প্রথম দিনের দেখাটি ভুলে উঠতে পারেনা,সেই প্রথম দিনের দেখার কথা ভাবে আর রাগে অভিমানে বলে সেদিন হয়তো দেখা না হলে ভালোই হতো, এরপর রাত্রি আর তার পাপাইয়ের কোনো খোঁজ-খবর নেয় না, আজ দুজনের জীবনে কি চলছে সে কথা কেউই জানেনা এত ভালোবাসা সবই অভিমানের অন্তরালে হারিয়ে গেছে, কিন্তু মেয়েটি আজও অপেক্ষারত তার প্রিয়তম র অপেক্ষায়... ...

নারীদের কথা

সুমনা নাথ
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

আমাদের দেশে বেশ কয়েকবছর আগে পর্যন্ত মনে করা হত মেয়েরা থাকবে ঘরবন্দি, তাদের নিজস্ব কিছু চাহিদা থাকবেনা, নিজস্ব কোনো মতামত থাকবেনা। তাকে বিয়ের আগে বাবার কথা আর বিয়ের পর স্বামীর কথা, শ্বশুর বাড়ির সমস্ত কথা মেনে চলতে হবে। সংসার করা, সন্তান মানুষ করা এটাই নাকি মেয়েদের একমাএ কাজ। মেয়েদের বলা হত পড়াশুনা করলে নাকি তাদের স্বামী মারা যাবে, এই ভয়েও অনেকে পড়াশুনা করত না পাছে যদি তার স্বামী মারা যায়। যদিও বা কেউ পড়াশুনা করতে চাইত তখন তার পরিবারকে বলা হত " "মেয়েকে উচ্ছন্নে পাঠানো হচ্ছে, তোমার মেয়ের দেখাদেখি আরও অনেক মেয়ে উচ্ছন্নে যাবে, সেটা যেন না হয় মেয়েদের আবার এত পড়াশুনা কীসের? এরপর আর কেউ বিয়ে করবে এই উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়েকে।" আবার বলা হত "মেয়েরা পড়াশুনা করলে নাকি সংসার রসাতলে যায়।" এইসব কথা শুনেও অনেক বাবা মা তাদের পড়াশুনা বন্ধ করিয়ে দিত। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে নারীদের মর্যাদা ছিল খুবই নিম্ন। কিন্তু বতর্মান পরিস্থিতি আলাদা এখন নারীরা পুরুষদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমস্ত কাজ করছে, নারীরা এখন কোনো অংশে পুরুষদের থেকে কম নয়। এখন নারীরা একদিকে যেমন সংসার সমলায় অন্যদিকে তেমনি দেশ সামলায়। একদিকে যেমন সন্তান মানুষ করে অন্যদিকে তেমনি শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশের নাগরিক তৈরি করে। একদিকে যেমন বাড়ির লোকের সেবা করে অন্যদিকে তেমনি হাসপাতালে রোগীদের সেবা করে। এখন নারীরা যেমন ক্রিকেট খেলে, ফুটবল খেলে, বক্সিং করে এবং জিমনাস্টিকও করে। তাদের পারদর্শিতা চতুর্দিকে লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক তথ্য: বতর্মানে নারীদের অবস্থার উন্নতি হলেও অনেক জায়গায় এখনো নারীরা পীড়িত, লাঞ্ছিত, ঘরবন্দি, পর্দাআবৃত। এখনো তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান পায় না। নারী তো দেবী মায়ের অংশ, দেবী মাকে জাঁকজমক করে পুজো করা হয় কিন্তু নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না। তাই সমস্ত নারীকে সম্মান করা উচিত।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়

অনুপমা ঘোষ
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

অনেকদিন ধরেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে একটা লেখা দেবো ভাবছিলাম । কিন্তু সাহিত্যগত জ্ঞান আমার সেই ভাবে না থাকায় লিখতে একটু ভয়ই পাচ্ছিলাম। তবুও সাহস করে লিখেই ফেললাম। লিখলাম আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা।

এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার ,আপনাদের তথা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীর গর্ব। এইরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টি সদ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং পথ চলা শুরু করেছে। নারী শক্তির ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিশ্বসৃষ্টি "কন্যাশ্রী প্রকল্প"-এর অনুকরণে আমাদের এই "কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেছেন। যাতে সমাজের প্রতিটি নারীই শিক্ষিত হয়ে সমাজ গড়ার কারিগর হয়ে ওঠে ও একজন ভালো মা হয়ে ওঠে যাতে সে সমাজকে সুনাগরিক উপহার দেয় এবং আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। এর জন্য আমি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

প্রথমদিকে, খুবই চিন্তিত ছিলাম কেননা একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, যে সদ্য মাটিতে পদার্পণ করেছে, তার উপর এখনো বিল্ডিং হয়নি এই ভেবে। কিন্তু প্রথম দিনের ক্লাসেই আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর ম্যাডাম ড.মিতা ব্যানার্জি আমার সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটালেন। তিনি আমাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে সমস্ত বিষয়গুলি জানিয়ে দিলেন। তারপর থেকে নির্দিষ্ট সময় মেনে অনলাইনে Google meet এর মাধ্যমে ক্লাস শুরু হয়ে গেল। এই ভাবে আমরা একটা সেমিস্টার পার করে দিলাম।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের এখনো সেই ভাবে কারোর সাথে পরিচয় হয়নি তবুও আমাদের বন্ডিং এত সুন্দর হয়ে উঠেছে সকলেই একটা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছি । সেটা শুধুমাত্র সহপাঠীদের মধ্যে নয় এটি আমাদের শিক্ষক -শিক্ষার্থীদের মধ্যেও। আমাদের ভাইস-চ্যান্সেলর ম্যাডাম ড. মিতা ব্যানার্জিকে পেয়ে আমরা ধন্য ।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অফিস স্টাফেরা রয়েছে তাঁরাও খুব ভালোভাবে কাজ করেন ।আমাদের বিভিন্ন সমস্যা যেমন অ্যাসাইনমেন্ট, ভর্তি, পরীক্ষা সংক্রান্ত, স্কলারশিপ সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো তাঁরা খুবই মনোযোগ ও যত্ন সহকারে সমাধান করার চেষ্টা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তরিকতার সাথে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়েছিল। আমরা সেখানে কিছু জন ছাত্রী উপস্থিত ছিলাম ।আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর ম্যাডাম পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ও আমরা সকলে মিলে একসাথে জাতীয় সংগীত গেয়েছিলাম ।ম্যাডাম , রেজিস্ট্রার স্যার এবং আমরা একসাথে বসে

এক টেবিলে টিফিন খেয়ে ছিলাম । সেই দিনটার কথা আজও মনে পড়ে যেদিন রেজিস্ট্রার স্যার আমাদের "ঘরের মেয়ে" তকমা দিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এই করোনা পরিস্থিতিতে মানুষকে সচেতন করার জন্য এবং সমাজের উন্নতি সাধন করার জন্য একটি webinar এর আয়োজন করা হয়েছিল । আমাদের বেশিরভাগ ছাত্রী যোগদান করেছিল ।

আমরা বিশ্বাস করি যে শুধুমাত্র শিক্ষাদান করাই শিক্ষকের কাজ নয়। পড়াশোনার সাথে সাথে শৃঙ্খলা,নিয়মানুবর্তিতা ও আচার-আচরণ ইত্যাদি গুণাবলীগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগরিত করতে হবে। সত্যিকারের মানুষ তৈরি করতে হবে। সেই নীতি মেনে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রতিনিয়ত প্রেরণা প্রদান করে যাচ্ছেন যাতে আমাদের মধ্যে মনুষত্ববোধ জাগ্রত হয়। এইখানেই আমরা আমাদের জীবন গড়ার কথা ভাবছি এবং সমাজ গড়ার আশা নিয়ে এগিয়ে চলেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব ধারায় । আমরা প্রত্যাশা রাখছি যে খুব শীঘ্রই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিং তৈরি হবে ও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে।

এর সাথে সাথে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আহবান জানাচ্ছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করবো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষা করব।

আমরা সকলে যেন মিলেমিশে থাকতে পারি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি এনে দিতে পারি -এটাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ।বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক -শিক্ষিকা এবং আমার সহপাঠীদের অশেষ ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার লেখায় ইতি টানলাম।

চিত্র ১

চিত্র ২

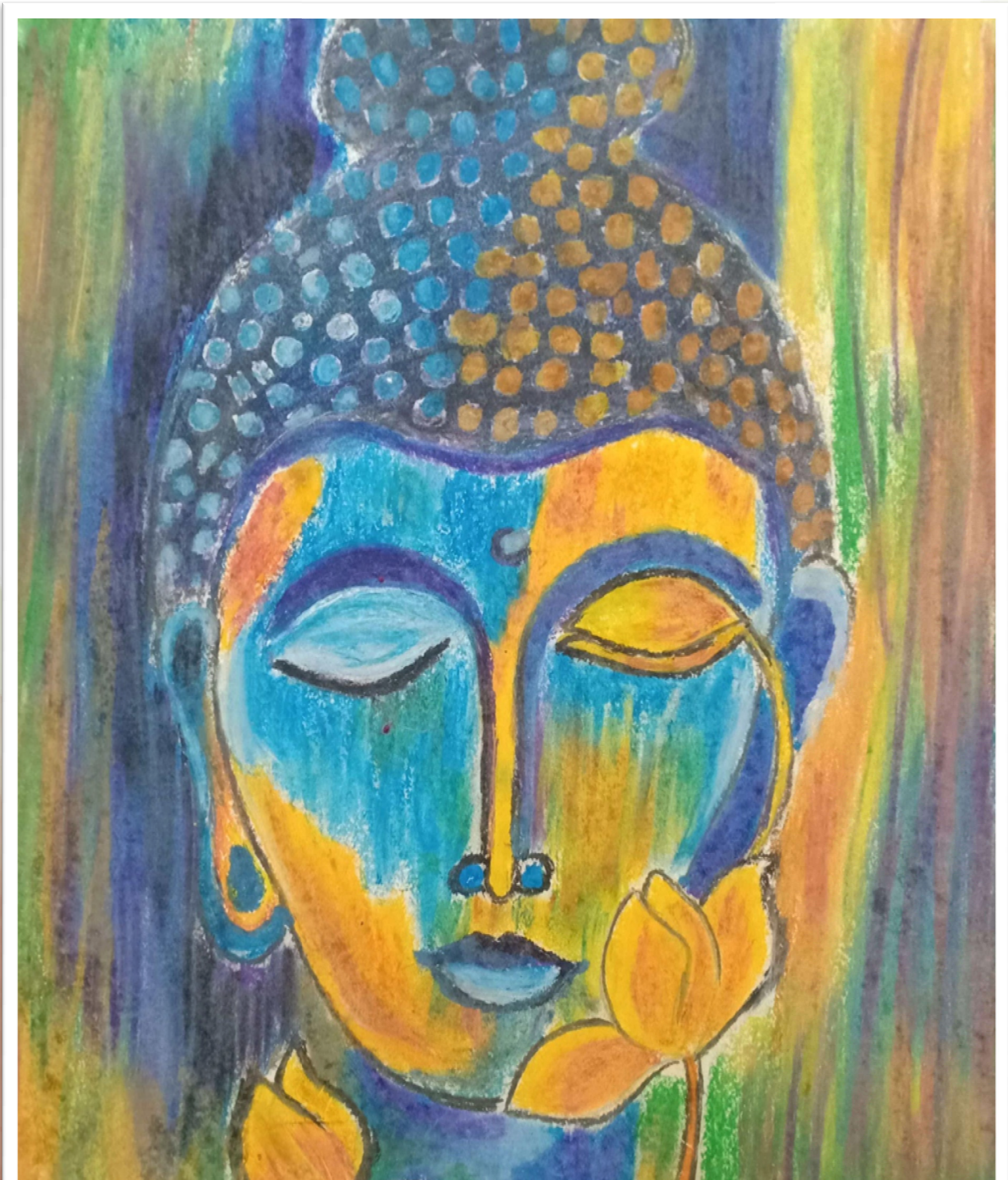

চিত্র ৩

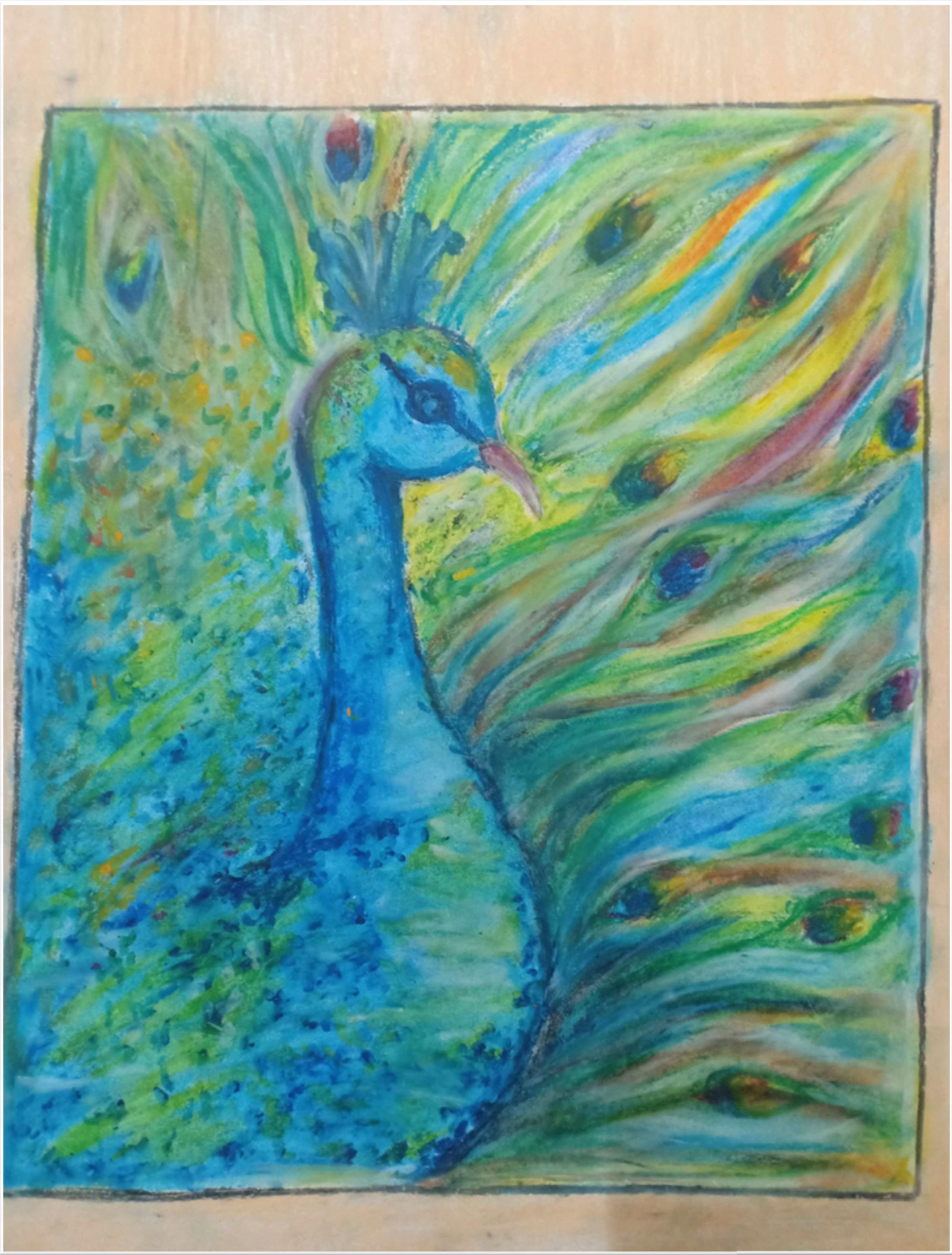

চিত্র ৪

চিত্র ৫

চিত্র ৬

ভেজিটেবল মশলা পরটা

মৃন্ময়ী সরেন
শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ

উপকরণ: ময়দা, লঙ্কা, পেঁয়াজ, বিনস, গাজর, আলু, ক্যাপসিকাম, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুড়ো, নুন, সাদা তেল এবং ঘি।

রান্নার প্রণালী: প্রথমে বিনস, গাজর,আলু, ক্যাপসিকাম সেদ্ধ করার জন্য ওভেনের উপর বসিয়ে দিতে হবে। ওই সময়ে পরিমাণ মতো লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনে গুড়ো, জিরে গুড়ো,নুন ইত্যাদি মিশিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে ময়দা এবং পরিমাণ মতো নুন মিশিয়ে নিয়ে এতক্ষণে সেদ্ধ হয়ে যাওয়া সবজি গুলো এর মধ্যে ঠেলে আরো ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। মাখানো হয়ে গেলে তার মধ্যে একটু তেল দিয়ে ডো তৈরি করে নিতে হবে। ডো গুলিকে পরটা আকারে বেলে ঘি দিয়ে ভেজে নিলে হয়ে গেল ভেজিটেবল মশলা পরটা।